অনীক

ডিসেম্বর ২০১২
বর্ষ ৪৯ ❑ সংখ্যা ৬

সম্পাদকীয় ❑ ১

ঘটনাপ্রবাহ
বাল থ্যাকারে ❑ শরদিন্দুশেখর রায় ❑ ২
আবার দোহা ❑ সমরেশ মিত্র ❑ ৪

প্রবন্ধ
ইসরায়েলি আগ্রাসনের নতুন অধ্যায় ❑ দীপ্র চৌধুরী ❑ ৬
বর্তমান ইউরোপের চালচিত্র ❑ সুচরিতা সেন ❑ ১০
সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার... ❑ সিদ্ধার্থ গুপ্ত ❑ ১৪
স্বদেশ, স্বরাজ ও স্বরাজ্য ❑ গর্গ চট্টোপাধ্যায় ❑ ১৯
আর্থিক অভিজাততন্ত্র ও ভারত সরকার ❑ বার্নি ❑ ২৩

পত্রপত্রিকা থেকে
'আধার' প্রকল্প ❑ দীপাঞ্জন সারখেল ❑ ৩৭

বার্ষিক সূচি : ২০১২ ❑ ৩৯

যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০
গ্রাহকদের যোগাযোগ : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**

সম্পাদকীয়

পার্লামেন্ট কি সত্যি সত্যিই শুওরের খোঁয়াড় ?

পার্লামেন্ট শুওরের খোঁয়াড়! না, কথাটা আমরা বলছি না, বলেছেন কার্ল মার্ক্স। তবে আমাদের দেশের পার্লামেন্টের কাণ্ডকারখানা দেখে কী বলা যায় সেটা ঠিক করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। এই সংশয়ের কথা ব্যক্ত করার জন্যই এই সম্পাদকীয়। এফডিআই নিয়ে পার্লামেন্টের সাম্প্রতিক অধিবেশনটির কথাই ভাবুন। কতো রঙ্গ-তামাশাই যে আমরা দেখলাম ক'দিন ধরে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে জনস্বার্থবাহী কোনো নীতিনিষ্ঠ অবস্থান একজনও কি নিয়েছেন? একের পর এক বিচার করে দেখুন।

গত বছর প্রণব মুখোপাধ্যায় যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তিনি পার্লামেন্টে জানিয়েছিলেন, বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ভারতে এফডিআই চালু করবে, কিন্তু রাজনৈতিক সহমত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তা চালু করা হবে না। এবার পার্লামেন্টে বিভিন্ন দল বা সদস্যের অবস্থান বা বক্তব্য থেকে ধরা পড়েছে, সেই সহমত মেলেনি। তাহলে? অথচ একই সরকার কাজ করছে, শুধুমাত্র অর্থমন্ত্রী পরিবর্তিত হয়েছে। তাতেই সরকারের সিদ্ধান্ত পাল্টে যাবে? এর নাম গণতন্ত্র!

এই বিলটি আসলে উত্থাপিত হয়েছিল দশ বছর আগে, ২০০২ সালের মে মাসে বিজেপি জোটের আমলে। তখন সেই সরকারের অর্থমন্ত্রী যশওয়ান্ত সিংকে চেয়ারম্যান করে গঠিত মন্ত্রীদের কমিটি, যার সদস্য ছিলেন ডিএমকে দল থেকে মন্ত্রী মুরাসলি মারানও, সুপারিশ করেছিল খুচরো ব্যবসায়ে ১০০ শতাংশ বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশের। এখন ক্ষমতাচ্যুত হবার পর থেকেই তাদের ভোল পাল্টে গেছে, তারা তাদের বহু পূর্ব-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে শুরু করেছে। পরে ক্ষমতায় এলে আবার তাদের মত উল্টে যাবে না— এর কোনো গ্যারান্টি আছে?

বর্তমান শাসকজোটের এখনও অংশীদার ডিএমকে এবং সদ্যজোটত্যাগী তৃণমূল কংগ্রেসও তখন সেই বিজেপি-জোট সরকারে ছিল এবং তারাও সেই ১০০ শতাংশ বিদেশি পুঁজির প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছিল। এমনকি বর্তমান শাসকজোটের জমানাতেও, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হবার আগে পযন্ত তৃণমূল সমগোত্রীয় বিশ্বায়নের নয়া উদারনীতিপন্থী বিভিন্ন বিলে সমর্থন জানিয়ে গেছে; কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু হলো যখন, তখনও তারা ক্যাবিনেট বৈঠকে 'অনুপস্থিত থেকে পরোক্ষ সমর্থন জানিয়েছে, কিন্তু সম্পর্ক খারাপ হবার পর থেকেই কেবল তারা সে সবের বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। আর তৃণমূলের একচ্ছত্র নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রে মন্ত্রী থাকার সময়, এবং এখন তাঁদের শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গেও নয়া উদারনীতিবাদী আর একটি কার্যক্রম পি-পি-পি মডেল প্রবল বিক্রমে কার্যকর করছেন। তাহলে কীভাবে আপনি এদের বিশ্বাস করবেন?

আরও দু'টি দল— সমাজবাদী দল ও বিএসপি— দু'পক্ষই এফডিআই-এর প্রচণ্ড বিরোধিতার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেও লোকসভার ভোটের সময় 'অনুপস্থিত' থেকে শাসকজোটকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের দ্বিচারিতার জ্বলন্ত প্রমাণ রেখেছে (অবশ্য এ ব্যাপারে পর্দার আড়ালে সিবিআই-এর ভূমিকার কথা অনুক্তই থেকে গেছে)। ফলত লোকসভার সংখাগরিষ্ঠ সদস্য এফডিআই-এর বিরোধী হলেও শাসকজোট 'সসম্মানে' পাশ করে গেছে।

স্বীকার করতেই হবে, সংসদীয় বামপন্থী দলগুলি সোচ্চারে এই বিলের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ক্ষমতায় বসলে তাঁরাও যে নয়া উদারনীতিবাদী কার্যক্রমকেই 'নান্য পন্থা' বলে আঁকড়ে ধরেন, তার কলঙ্কিত নজিরও তাঁরা তাঁদের শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গে রেখে গেছেন, তাই তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতাও আজ ভূলুণ্ঠিত। তাহলে!

আর মূল শাসকদল কংগ্রেসের কথা লিখতেও লজ্জা হয়। মার্কিন পত্রপত্রিকায় 'অপদার্থ' হিসেবে চিহ্নিত মার্কিনদেশের স্বার্থে মনপ্রাণনিয়োগকারী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা এখন সমগ্র দলটিকেই নিজেদের পকেটে পুরে ফেলেছেন। তার উপর ওবামার ভর্ৎসনায় মর্মাহত এবং কিছু করে দেখাতে বদ্ধপরিকর হয়ে আগ্রাসী পদ্ধতিতে নয়া উদারনীতিবাদী সব কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে চলেছেন এই পার্লামেন্টকেই ব্যবহার করে।

এরপরও পার্লামেন্টকে 'শুওরের খোঁয়াড়' বলবেন কিনা এখন পাঠকবর্গই বিচার করে সিদ্ধান্ত নিন!

বাল থ্যাকারে

শিবসেনা প্রধান বাল থ্যাকারের মৃত্যু হল ১৭ নভেম্বর, ২০১২ (২৩ জানুয়ারি, ১৯২৬— ১৭ নভেম্বর, ২০১২)। মৃত্যুর আগে ও পরে মুম্বাই-এর জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। শোকে এবং শঙ্কায়। জনমানসে ভক্তি এবং ভীতি, আবেগ-বিহ্বলতা এবং ত্রাসের বিপন্নতা কোনটাই অবিমিশ্র ছিল না। বস্তুত, এসব কিছুরই রসায়নে গড়ে উঠেছিল বাল থ্যাকারের রাজনৈতিক জীবননাট্য। থ্যাকারে কল্পিত মারাঠি-মানস মখমলে ঢাকা এক ভয়ংকর ফল্ট-লাইন। ভূতাত্ত্বিক বিভাজন রেখার থেকে যা অনেক বেশি বিপজ্জনক ও বিস্ফোরক। এর একদিকে ক্ষোভ ও হতাশার মারাঠি 'আপন', অন্যদিক সদা পরিবর্তনশীল 'অপর'-এর চরম বিপন্নতা। অন্য সময়ের মত থ্যাকারের মৃত্যুর সময়েও এই আপন-অপর-এর যুদ্ধাগ্নি জ্বলে উঠতে পারত অনায়াসেই। শোকের মধ্যেও তাই ছিল শঙ্কার ত্রাস।

শিবসেনা এবং বাল থ্যাকারে অবিচ্ছেদ্য রাজনৈতিক সত্তা। কার্টুনিস্ট বাল থ্যাকারের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল ও প্রখর ছিল শিবসেনা প্রধান হিসাবে তাঁর নিয়ন্ত্রক ভূমিকা। মহারাষ্ট্রে ১৯৯৫-এর প্রথম সেনা-বিজেপি সরকারের 'রিমোট কন্ট্রোল' হিসাবে নিজেকে নিজেই আখ্যায়িত করেছিলেন বাল থ্যাকারে। কমিউনিস্ট-বিরোধী সোশ্যালিস্ট পিতা প্রবোধাঙ্কর থ্যাকারের পুত্র বাল থ্যাকারে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সংগঠনের নামকরণ করেছিলেন শিব-সেনা বা 'আর্মি অফ শিবাজি'। জাতীয় আন্দোলনের আদি পর্বে আর এক মারাঠাকুলপতি উচ্চ-বর্গীয় চিতপাবন ব্রাহ্মণ বাল গঙ্গাধর তিলক শিবাজিকে এক প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক কাল্ট ফিগারে পরিণত করেছিলেন। আর এক উচ্চবর্গীয় চন্দ্রসেনীয় কায়স্থ প্রভু পরিবারের সন্তান ১৯৬০-এর দশকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিবাজির নামাঙ্কিত শিবসেনাকে পরিণত করলেন এক সংকীর্ণ বিভাজক শক্তির হাতিয়ারে। শিবসেনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯ জুন, ১৯৬৬ সালে, একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে। কিন্তু জ্যোতিবা ফুলে, বাবা আম্বেদকরের মত মহান পূর্বসুরীদের সামাজিক সংগঠকদের ঐতিহ্যাশ্রিত স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল বা নিম্নবর্গের অবস্থার উন্নতির জন্য নিবেদেত সামাজিক সংগঠন নয়— শিব-সেনা প্রথম থেকেই ভূমিপুত্রদের অধিকারের সংকীর্ণ দাবিভিত্তিক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অচিরেই অনিবার্যভাবে তার গতিমুখ হয় রাজনৈতিক। প্রাথমিকভাবে এর সামাজিক ভিত্তি ছিল কোঙ্কন অঞ্চলের অভিবাসী মারাঠি শ্রমিক। সময়ের সাথে সাথে মারাঠি জনগোষ্ঠীর এক বিপুল অংশের সমর্থন লাভ করে। বাল থ্যাকারের 'গৈরিক ঝড়'-এর মতাদর্শ ও কার্যক্রমের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে শিব-সেনা।

বাল থ্যাকারে (এবং অবশ্যই শিবসেনা-র) উত্থানপর্ব বিগত শতকের ছয়ের দশকের শেষ ভাগে। নেহরু-উত্তর ভারতে কংগ্রেস এক-দলীয় রাজনৈতিক প্রাধান্য তখন আসন্নপ্রায়। চরম খাদ্যসংকট এবং শিল্পোৎপাদনের অধোগতি অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে। টাকার অবমূল্যায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্বিষহ বেকারি। কংগ্রেস-ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অসম বিকাশের বিরুদ্ধে অঞ্চল-বর্ণ-জাতপাত-ধর্ম প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে অস্থিরতা ভারতের সামাজিক ছন্দগুলিকে ক্রমশ প্রকট করে তুলছে। এই অবস্থা ছিল পরিচিতি রাজনীতির উত্থানের আদি পর্ব। কিন্তু তা বহুমাত্রিক সামাজিক ভিত্তি ও মতাদর্শকে আশ্রয় করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। উদাহরণ হিসাবে উত্থাপন করা চলে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের ভিন্নধর্মী বিন্যাস। ঠিক এই সময়েই 'বাঙলাকে কেন্দ্রের কলোনি হতে দেব না' এই শ্লোগান পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী রাজনৈতিক পরিসরকে আরও সংহত হতে সাহায্য করে। প্রায় আঞ্চলিক পরিচিতি সত্তার স্লোগান হওয়া সত্ত্বেও তা সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ হয়ে যায় নি। 'আমরা বাঙালি'-র মত সংগঠন এর ফলে বাড়তি উদ্যম সঞ্চয় করতে সাহসী হয় নি। বিহারি খেদাও বা ওড়িয়া তাড়াও-এর মত কোন কার্যক্রম আদপেই পাত্তা পায়নি। বরং তা শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত আন্দোলনকে, প্রসারমান বামপন্থী আন্দোলনকে আরও সংহত করেছিল। পরিণতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট, যার গণতান্ত্রিক দ্যোতনা ছিল সুনিশ্চিত। বামব্যবস্থার এই প্রসারমান পরিস্থিতি এক বিপুল সংখ্যক মেধাবী রাজনৈতিক কর্মী 'দুনিয়া পাল্টাও, নিজেকে পাল্টাও' এই যুগান্তকারী আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহের ন্যায়সঙ্গত পথে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। শ্রমিক কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন 'গ্রামে চলো', গ্রহণ করেছিলেন নকশালবাড়ীর পথ। মতাদর্শের এই ভিত্তি পরিচিতি রাজনীতির সংকীর্ণ সম্ভাবনাকে বিনাশ করেছিল। প্রমাণিত হয়েছে পরিচিতি-রাজনীতির কোন বাস্তব অবস্থাই মতাদর্শ-নিরপেক্ষ নয়। ঠিক উল্টোটাই ঘটল মহারাষ্ট্রে বাল থ্যাকারের শিব-সেনাকে কেন্দ্র করে।

১৯৬০-এর দশকের শেষ থেকে মহারাষ্ট্র-কর্নাটিক সীমান্ত এলাকায় সংঘাতের সময় শিবসেনারা মারাঠিদের সংগঠিত করার মধ্যে দিয়ে বাল থ্যাকারে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে পরিচিত হতে থাকেন। আক্রমণ শাণিত হতে থাকে দক্ষিণ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে। আক্রমণের কেন্দ্র হয়ে উঠে উদিপি হোটেল এবং ক্ষুদ্র গুজরাটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি। এক জঙ্গি ঝটিকাবাহিনী হিসাবে শিবসেনারা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কর্মহীন মারাঠিদের হতাশা ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশে ঘৃতাহুতি সামনে রেখে অচিরেই আক্রমণ

পরিচালিত হতে থাকে মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে সংগঠিত কমিউনিস্ট প্রভাবিত সুতাকল শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে। এই সংগঠিত বামপন্থী ইউনিয়নগুলিকে শিবসেনার আক্রমণে গোপন মদত দিত মিল-মালিকরা। কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বসন্তরাও নায়েকের কাছে বাল থ্যাকারের এই ট্রেড-ইউনিয়নবিরোধী জঙ্গিপনা অনাকাঙ্খিত ছিল না। কেননা বসন্তরাও নায়েক এবং একইসঙ্গে সুতাকল মালিকেরা শ্রমজীবীদের মধ্যে বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। পারেলে দলভি ভবনে সিপিআই-এর অফিস আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত হলেন সিপিআই-সিপিএম-এর কর্মীরা। ছবারের পুর প্রতিনিধি এবং তৎকালীন সিপিআইএমএল-এর কৃষ্ণ দেশাইকে হত্যা করা হল। একের পর এক ইউনিয়নগুলি দখল করল শিবসেনা। ১৯৭২ সালে বাল থ্যাকারে গড়লেন ভারতীয় কামগড় সেনা। গঠিত হল স্থানীয় লোকধিকার সমিতি। ব্যাঙ্ক, বিমা, রেলওয়ে প্রভৃতি পরিষেবা শিল্পে মারাঠি নিযুক্তির জন্য চাপ দেওয়া হতে থাকল। আরও পরবর্তীকালে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলে বিহার, উত্তরপ্রদেশের শ্রমিক এবং স্বনিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষ। শ্রমজীবী মানুষকে আক্রমণের মধ্যে গিয়ে বাল থ্যাকারের শিবসেনা পুঁজির শাসনের নির্ভরযোগ্য মিত্রে পরিণত হল। সংকীর্ণ পরিচিতি রাজনীতির ঝোঁক হল ঠিক এটাই যে তা পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত হতাশা এবং ক্রোধকে সংগঠিত করে না। শ্রমজীবী মানুষকেই 'অপর' হিসাবে চিহ্নিত করে এক হিংস্র বিভাজক শক্তিতে পরিণত করে। বাল থ্যাকারের শ্রমজীবী-বিরোধী ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনে আসল শিকার শ্রমিক জনতা।

বাল থ্যাকারের এই শ্রমজীবী-বিরোধী ভূমিকায় প্রকাশ্য ও গোপন সহায়তা দিয়েছে মহারাষ্ট্র কংগ্রেস। বসন্তরাও নায়েক এবং বসন্তদাদা পাতিল শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে জব্দ করার জন্য এবং বামপন্থীদের প্রভাব হ্রাস করতে বাল থ্যাকারে এবং শিবসেনার জঙ্গিপনা বজায় রাখতে সাহায্য করেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা এবং সঞ্জয় গান্ধীর জনবিরোধী যাবতীয় কার্যক্রম প্রকাশ্যেই সমর্থন করেছিলেন বাল থ্যাকারে। বাল থ্যাকারে এবং সামানার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগগুলি নিয়ে শুধু সেনা-বিজেপি সরকারই নয়, কংগ্রেস-এনসিপি সরকারও নিষ্ক্রিয় থেকেছে। এনডিএ-র জোটসঙ্গী হলেও তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিভা পাতিল এবং পরে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সমর্থন দিতে দ্বিধা করেননি একটি কর্পোরেট লবির ইঙ্গিতে।

থ্যাকারের আদর্শগত ভিত্তির অন্যতম উপাদান মুসলিম বিরোধী জঙ্গি হিন্দুত্ব। থ্যাকারে কল্পিত মারাঠি অস্মিতার সবচেয়ে বড় ফল্ট বা বিভাজন রেখা মুসলিম ধর্ম। তিনি হিটলারের অনুগামী। হিটলারের অ্যান্টি-সেমেটিজমের মতই থ্যাকারের মুসলিম বিদ্বেষ। থ্যাকারের হিন্দুত্ব বেদ, গীতা বা পুরাণ আশ্রিত নয়, তা আধুনিক প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় তৈরি ইমেজ ও উত্তেজক বক্তৃতার দ্বারা প্রণোদিত। সর্বাংশেই তা রাজনৈতিক এবং ক্ষমতা ও ভীতির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। ধর্ম থ্যাকারের পরিচিতির এমন এক ব্যাপক এবং সর্বোচ্চ স্তর যেখানে জনতা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। বিজেপি-র মতই তাঁর ধারণা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ মূলতঃ হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ। ধর্ম 'রক্তে এবং বিশ্বাসে'। থ্যাকারের হিন্দুত্বের প্রাথমিক পরিচয় মেলে দুর্গাগড়ি মন্দির "মসজিদ সংঘর্ষে কেন্দ্র করে" ১৯৭০-এর ডিওয়াণ্ডি, জলগাঁও মাহাদের কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্রের প্রতিটি দাঙ্গায় শিবসেনার হাত কলুষিত। ১৯৮৭র ভিলে পার্লে উপনির্বাচনে থ্যাকারে মার্কা হিন্দুত্বের শিবসেনার জয় প্রথম বিধানসভার নির্বাচনী সাফল্য যা ১৯৯৫-র বিজেপি সেনা সরকার প্রতিষ্ঠায় পরিণতি লাভ করে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ১৯৯২-৯৩ সাম্প্রদায়িক গণহত্যায় শিবসেনার জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী ভূমিকা ছিল নৃশংসতম।

১৯৮৭ তে সাম্প্রদায়িক জিগির তোলার অপরাধে থ্যাকারে ছয় বছরের জন্য ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু তাতেও তাঁকে স্তিমিত করা যায় নি। বস্তুত ক্ষমতার যে ধরন থ্যাকারে অনুশীলন করতেন তাতে সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োজনীয় হলেও অত্যাবশ্যক ছিল না। বস্তুত নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন এক নির্বোধ হিংসার শক্তি যা এক ভীতির পরিশেষে তাঁর ক্ষমতা অনুশীলনের চারণভূমিতে পরিণত করেছিল। ফ্যাসিবাদী ক্ষমতার পদ্ধতি প্রকরণের সঙ্গে থ্যাকারের ধরনের সাজুয্য এখানেই। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিক থেকে এক হতাশা ও ক্রোধের পরিবেশ পরিব্যাপ্ত হতে থাকে রাষ্ট্র কাঠামোর এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবর্ধমান বৈধতা হ্রাস পেতে থাকে। এই পরিবেশেই থাকারের জঙ্গি হিংসার পদ্ধতি মারাঠি ক্রোধ ও হতাশার বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই গণমানসে, বিশেষ মধ্যবিত্ত মানসে বৈধতার নৈতিকতা অর্জন করে। শিব-সেনার ভূমিকা ছিল কামি-কাম্পির মত বা ব্রাউন শার্ট বা ব্ল্যাক শার্টের মত প্যারাট্রুপারের। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জঙ্গি সংগঠনে থ্যাকারের নির্দেশই ছিল শেষ সংকেত। আরএসএস-এর অনুকরণে শিবসেনার শাখা গড়ে উঠেছিল স্থানীয় ও অঞ্চল স্তরে কিন্তু দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের কোন অবকাশ ছিল না। ব্যাল থ্যাকারেই ছিলেন শিব-সেনার চূড়ান্ত নির্দেশ। থ্যাকারের সংযোগের ভাষা, বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গের ব্যবহার, নির্দেশাত্মক ভঙ্গি তাঁকে এক মোহময় আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছিল, পরিণত করেছিল ক্ষমতার এক পাল্টা প্রতিষ্ঠান হিসাবে। এক সংকীর্ণ বিভাজন মতাদর্শের অবগুণ্ঠন হিসাবে কাজ করেছিল এই আক্রমণবাদ ও উত্তেজক সম্মিলিত মানসিকতা প্রতিফলন। এক নির্বোধ হিংসায় মিলত কল্পিত

মুক্তি। খাদ্যের সংকট, বাসস্থানের সংকট, জীবিকার সংকট, ভোগ্যপণ্যের অভাববোধের সংকট, আইনি অধিকারের সংকট প্রভৃতি বাস্তবতা থেকে। এক 'অপর' চিহ্নিত হয়ে যায় কখনও দক্ষিণীরা, কখনও উত্তর ভারতীয়, কখনও মুসলমান, কখনও পাকিস্তান। এই অপরের বিরুদ্ধে সংহত হয় এক অলীক 'আপন' এক অস্পষ্ট, দিশাহীন, মতাদর্শত-বিবর্জিত অতি-কল্পনার জগৎ, যা বাল থ্যাকারের মত মসিহার চারণভূমি।

ভীতি প্রদর্শনের এই ক্ষমতার সাহায্যেই তিনি বশে এনেছিলেন বলিউডকে, গ্রহণ করেছিলেন হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক পুলিশের ভূমিকা। বলিউডের বিনিয়োগকারী বা চিত্রতারকা কুশীলবেরা তাঁর প্রসাদধন্য হওয়ায় ইঁদুর দৌড়ে সামিল হতেন, কেননা তাঁর অঙ্গুলি হেলনেই বন্ধ হয়ে যেতে পারত যে কোন চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী, আক্রান্ত হতে পারতেন তারকারা। সীমাহীন ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই দিলীপকুমারকে নির্দেশ দেওয়া হয় পাকিস্তানী সম্মান ফিরিয়ে দিতে, বন্ধ করে দেওয়া হয় পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ বা পাকিস্তানি সঙ্গীত শিল্পীর অনুষ্ঠান। মুম্বাইয়ের বিনোদন বিনিয়োগে শিব-সেনা ও দাউদ হিব্রাহিমের ভূমিকার সমাপতন ছিল লক্ষ্যণীয়।

পরিচিতির রাজনীতির পপুলিজমের সাথে ফ্যাসিবাদের আর একটি সাযুজ্য ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাংগঠনিক ধরন। ভারতের মতো দেশে তা আরও কদর্য রূপ নিয়েছে পারিবারিক রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের। কংগ্রেসের মত শিবসেনাও এই একই সংস্কৃতি রপ্ত করেছে। শিবসেনা মন্ডল কমিশনের রূপায়ণের বিরোধিতা করায় ছগন ভুজবল দলত্যাগ করেন, কোঙ্কন অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারেন এই আশঙ্কায় নারায়ণ রানের ক্ষমতা হ্রাস করলে তিনিও দলত্যাগ করেন। রাজ থ্যাকারে আরও দক্ষ সংগঠক হওয়া সত্ত্বেও পুত্র উদ্ধব থ্যাকারের প্রতিই ছিল শিবসেনা প্রধানের পক্ষপাত। ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বাল থ্যাকারে নির্ভরতা সত্ত্বেও যে শিবসেনা তাঁর জীবনকালে অটুট থাকতে পেরেছে এমন নয়। বরং তাঁর জীবিতকালেই শিবসেনা সীমাবদ্ধ থেকেছে মহারাষ্ট্রের মূলত শহরকেন্দ্রিক শক্তি হিসাবে পুঁজির সহায়ক হয়ে। মহারাষ্ট্রেরই বিদর্ভে কৃষকের আত্মহত্যার মৃত্যুমিছিলে তাই শিবসেনার কোন ভাববিকার চোখে পড়ে না।

ডি ডি কোশাম্বি একদা মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতে সামাজিক বহুমাত্রিকতায় বিস্তার এমনই যে চরম দক্ষিণপন্থী বা চরম বামপন্থী শক্তিও কোন না কোন সামাজিক উপাদানের ভিত্তি করে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে। বাল থ্যাকারে-হীন শিবসেনাও হয়ত তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে। কিন্তু শঙ্কার কথা এই যে শিবসেনার মত আঞ্চলিক, হিন্দুত্ববাদী-ফ্যাসিবাদী শক্তি সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে আগ্রাহ্য করে যেভাবে বেড়ে উঠছে, ভারত রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ যেভাবে তাতে মদত জোগাচ্ছে তাতে উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিহাস এই যে, সমস্ত সাংবিধানিক রীতিনীতি যিনি সদম্ভে তাচ্ছিল্য করেছেন সেই বাল থ্যাকারের অন্ত্যেষ্টি সম্পূর্ণ হল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়!

শরদিন্দুশেখর রায়

আবার দোহা— কী পেলাম?

বিশ্বের পরিবেশকে বাজি রেখে অনিঃশেষ গৃধ্নুতা আর লাগামহীন শোষণের যে রঙ্গ বিশ্ব-পুঁজিবাদ শুরু করেছিলো সেই তথাকথিত শিল্পবিপ্লবের সূচনালগ্নে, প্রকৃতি সেই অপরাধের প্রতিশোধ নিচ্ছে তার আপন উপায়ে। বিজ্ঞানী এবং সমাজতাত্ত্বিকরা গত শতকের মধ্যভাগ থেকে ভূ-উষ্ণায়ণ জনিত সংকটের জন্য পুঁজিবাদী অতি-উৎপাদন প্রক্রিয়াকে একটি মুখ্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্ব জনমতের চাপের কাছে সামরিকভাবে নতি স্বীকার করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো জাপানের কিয়োটো শহরে মিলিত হয়ে কিয়োটো-বিধি প্রণয়ন করে। এই বিধি মতে 'উন্নত দেশ' সমূহ তাদের দেশের পণ্য উৎপাদন সহ শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় কার্বন নির্মগনের পরিমাণ কমাবে। এই বিধিমতে কাজ কেমন হচ্ছে সে বিষয়ে নজরদারির জন্য এই বিধিতে যারা সই দিয়েছে, সেই সদস্য দেশগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে মিলিত হয়ে সেই বিষয়ে মত বিনিময় করবে। এই দফায় দফায় আলোচনার জন্য মিলিত হওয়ার পোষাকি নাম হলো কনফারেন্স অফ দি পার্টিস বা কপ্।

বর্তমানে ১৮তম দফার সম্মেলনটি কাতার দেশটির শহর দোহা-তে অনুষ্ঠিত হলো। এর আগেও একবার দোহা-র সম্মেলন প্রায় ভন্ডুল হয়ে যায় কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের অনমনীয় অবস্থানের জন্য। যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এই সম্মেলন শুরু হয়েছিলো, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিশ্বের উন্নয়নশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলির চাপে অস্থির হয়ে উঠছিলো, বর্তমানে সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠে মার্কিন দেশ সহ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

কানকুন, বা ডারবান বা দোহাতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাকে যথাসম্ভব লঘু করার জন্য মার্কিন দেশ সহ অন্যান্য অনেক দেশ সেই সম্মেলনে মন্ত্রী স্তরের প্রতিনিধি পাঠানোর পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম এমন নীচু পদাধিকারের আমলাদের পাঠায়। স্বভাবতই এই আমলাদের বিশ্বরাজনীতি এবং নিজ নিজ দেশের পররাষ্ট্রনীতি সহ অভ্যন্তরীণ নীতি বিষয়ক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া বা কোনো বিধিতে সম্মতি প্রদান করার এক্রিয়ার ছিল না। স্বভাবতই এমন অবস্থায় কোনো নীতি বিষয়ক বা নীতি

নির্ধারক আলোচনা করা সম্ভব নয়; বাস্তবত তা হয় নি। তাই ঠিক হয় নীতিগত বিষয় এড়িয়ে গিয়ে অতঃপর ভূ-উষ্ণায়ণ ছাড়া অন্যান্য 'আশপাশের বিষয়' নিয়ে এই সব সম্মেলনে আলোচনা হবে— যদিও সম্মেলনগুলির অন্যতম মূল উদ্দেশ্যই ছিলো কার্বন নির্গমন কমিয়ে কেমনভাবে ভূ-উষ্ণয়নের মোকাবিলা করা যায় সে বিষয়ে নীতি রূপায়ণ করা!

ডিসেম্বর ২০০৯-এ কোপেনহাগেন সম্মেলন এই একইভাবে ভেস্তে যায়। অথচ ১৯৯০ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু সংক্রান্ত সম্মেলনে সাধারণ সমঝোতার ভিত্তিতে সে রিপোর্ট পেশ করা হয়, তাতে আগামী দু-দশকে ভূ-উষ্ণায়ণের ফলে বিশ্ব জলবায়ুর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে যে সব ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিলো, তা গড়পরতা মিলে যাচ্ছে। দোহার সাম্প্রতিক সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হলো, তখনও অবস্থার কোনো আশাব্যঞ্জক উন্নতি ঘটেনি।

অথচ দুসপ্তাহ ধরে দফায় দফায় আলোচনা করে এই সম্মেলন থেকে যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিবৃতি প্রচারিত হলো তাতে বর্তমান স্থিতাবস্থা বজায় রেখে পরবর্তী ১৯তম দফার, যা প্যারিস শহরে ২০১৫-তে অনুষ্ঠিত হবে, তার জন্য তুলে রাখা হলো। ইতিমধ্যে কিয়োটো বিধি-র কার্যকাল বাড়িয়ে ২০২০ পর্যন্ত করা হয়েছে, যার পর আবার নতুন বিধি তৈরি করা হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্পের (ইউএনইপি) মুখ্য বিজ্ঞানী অধ্যাপক জোশেফ আলকামো এই বিষয়ে আগাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর মতে (যা কিনা ১৩৭টি দেশের সর্বসম্মত মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত) পৃথিবীর মোট কার্বন নির্গমন ২০৩০ সালের ভেতর বর্তমান নির্গমনের ২৫ শতাংশ কমাতেই হবে। তাই এই বিষয়ে করণীয় বিষয়কে ২০২০ সাল পর্যন্ত পেছিয়ে দেওয়াটা বিশ্ববাসীর প্রতি অপরাধের সমতুল্য।

কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনা বিষয়ক সমঝোতার জন্য আহূত গত তিন-চারটে বহু-দেশীয় সম্মেলন কিয়োটো-বিধি ক্রমাগত লঘু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০০৯ সালে মার্কিন দেশ সহ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলি যে ন্যক্করজনক ভূমিকা গ্রহণ করে সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করেছে, ২০১৫ প্যারিসে তার চেয়ে অন্যরকম কিছু ঘটবে, এমন আশা আজকাল এমনকি ঘোর সংস্কারপন্থী বিপ্লব-বিরোধী গোষ্ঠীও শোষণ করেন না। বরং দোহাতে যে কুনাট্যের অভিনয় ঘটলো, ভবিষ্যতে তা আরও ঘনীভূত হবে, এমন ইঙ্গিতই মিলল বর্তমান দফার দোহা-র আলোচনা সম্মেলন থেকে।

প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশ তাদের নিজস্ব উৎপাদন লক্ষমাত্রা এবং কার্বন-কেন্দ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে এক চুলও সরতে রাজি নয়। তাদের অর্থনীতি, আঞ্চলিক আধিপত্য ইত্যাদি সব কিছুই বজায় রেখে তারা চাইছে যে অন্য দেশগুলো তাদের এই সব আপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনুক। এই বিষয়ে অনাচারের পান্ডা হলো ওবামা-র নেতৃত্বে (তারও আগে বুশের নেতৃত্বে) মার্কিন দেশ, যারা কিয়োটো বিধির মুসাবিদা করেছে, বিশ্বের বহু দেশকে প্রায় বাধ্য করেছে এই বিধিতে সই করতে, যে বিধির অন্যতম শর্তই হলো যে একবার বিধিতে সই দিলে বিধির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই বিধি থেকে নাম প্রত্যাহার করা যাবে না, মার্কিন দেশ প্রথমেই এই বিধি থেকে নাম প্রত্যাহার করে কিয়োটো বিধি মোতাবেক তার যে পরিমাণ কার্বন নির্গমন কমানোর দায় ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি কার্বন নির্গমনের এক বিধি প্রণয়ন করে সেটি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। নেশাগ্রস্তর প্রতিশ্রুতির যেমন কোনও দাম নেই, মার্কিন দেশের প্রতিশ্রুতিরও তেমন কোনও মূল্য নেই। নিজের প্রণয়ন করা বিধিও গত সাত বছরে মার্কিন দেশ মানে নি।

একটা সময় ছিলো যখন চীন সারা পৃথিবীর ৮৫ শতাংশ শোষিত মানুষের কাছে এক উদাহরণ স্বরূপ আদর্শরূপে পুঁজিবাদী দর্শনকে বাস্তবে চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থায় ছিলো। তারপর হোয়াং হো নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। সে যুগে (কিসিংগার-পূর্ব মার্কিন কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির যুগে) মার্কিন দেশ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে চীনকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা নেয়। দ্বন্দ্বটা ছিলো দুটি বিপরীতমুখী আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব। কিসিংগারের দৌত্যে পিংপং কূটনীতির আবাহনে এবং নানান বাস্তব কারণে সারা দুনিয়ার ঘুম আজ আর মাও সে তু-এর ডাকে ভাঙে না। চীন তার পূর্বের সেই রাজনৈতিক ধার অনেকটা হারিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর ফলে স্রেফ অর্থনৈতিক আয়তন বাড়িয়ে আজ সে মার্কিন দেশের কাছে বিপদের কারণ। রাজনৈতিক কারণে নয় (যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজনৈতিক-অর্থনীতি আর মার্কিন দেশের ঐ বস্তুটির মধ্যে কোনও বিরোধ নেই, বিরোধ কেবল বাজার দখল নিয়ে), অর্থনীতির কারণেই আজ আবার মার্কিন দেশ তার অতীতের চীনকে অর্থনৈতিক অবরোধে ফেলার নীতি গ্রহণ করছে। সে দিকে নজর রেখে মার্কিন দেশ চীনকে বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী এক মুখ্য দেশ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছে। (যা বাস্তবে অনেকটাই সত্যি!) রাজনৈতিক স্তরে এই বিরোধ নিরসন না হলে বিশ্ব সম্মেলন করে এই বিরোধের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়।

এই উতোর-চাপানের মধ্যে পড়ে একটি গুরুতর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রশ্ন অন্তরালে চলে যাচ্ছে। মার্কিন দেশ সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কিয়োটো বিধি মতে তার দায়-দায়িত্ব কমানোর সময় বারে বারে বলছে যে চীনকে উন্নয়নশীল দেশ বলার পরিবর্তে মার্কিন দেশের মতো উন্নত দেশ হিসাবে গণ্য করে চীনকেও মার্কিন দেশের মতো কার্বন নির্গমন বিপুল পরিমানে কমানোর জন্য বাধ্য করা হোক। কিন্তু কিয়োটো-বিধির

এর পর ২২ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

ইসরায়েলি আগ্রাসনের নতুন অধ্যায় : গাজা পর্ব

দীপ্র চৌধুরী

অতীতে চরম অত্যাচারিত ও নির্যাতিত কোনো জাতি বা গোষ্ঠী বা দেশ যদি পরবর্তীকালে নিজেরাই অন্য কারও ওপর সেই একই ধরণের অন্যায় আচরণে লিপ্ত হয়, তা-ও সাম্রাজ্যবাদীদের মদতে, তবে তার চেয়ে দুঃখজনক ও ঘৃণ্য আর কী হতে পারে! বর্তমান পৃথিবীতে এরই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইসরায়েল— এক চরম ঘৃণ্য ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যারা চালিয়ে যাচ্ছে বিগত কয়েক দশক ধরে। এরই সাম্প্রতিকতম নজির হচ্ছে প্যালেস্টাইনের গাজাতে তাদের চলমান আক্রমণ।

যে কথা দিয়ে আমরা এই নিবন্ধ শুরু করেছি, প্রথমেই সেটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ধনতন্ত্রের বিকাশের প্রক্রিয়ায় উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলি ক্রমশ স্বতন্ত্রভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে আলাদা জাতিরাষ্ট্র গঠন করতে শুরু করলো, তখন তার সাথে সাথে একটি চরম ক্ষতিকর মানসিকতাও যে অনেক সময়ে অন্তর্লীন থেকে যায়, কিন্তু তখন সেটা অনেকেই খেয়াল করেন নি। সেই সময় থেকেই 'সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি' বা 'আমাদের জাতিই সর্বোত্তম জাতি' জাতীয় মানসিকতা, কিংবা তাকেই আর একটু প্রলম্বিত করে 'বাকি সবার স্থান অনেক নিচুতে' বা 'তাদের বেঁচে থাকারই কোনো প্রয়োজন নেই' জাতীয় জাতিবিদ্বেষী চরম অবস্থানে পৌঁছে যাবার অনেক উদাহরণও মিলে যাবে। এই মানসিকতাই সেযুগে, কিংবা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের সূচনার পর থেকে বহু ক্ষেত্রে পারস্পরিক হানাহানি বা যুদ্ধের উৎস বা আনুসঙ্গিক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

ইহুদিবাদ (Zionism)ও জন্ম নিয়েছিল ওই পটভূমিকাতেই। ইহুদিদের সাথে প্রথমে খৃষ্টানদের এবং পরবর্তীকালে মুসলিমদের দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিণতিতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে তারা বিচ্ছিন্ন ও প্রায়-অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে অত্যাচার ও নির্যাতনের ক্রমিক ধারাবাহিকতা। ক্রমে ক্রমে বিভিন্নরূপে কার্যায়িত ওই 'পগ্রম'-এর শিকার এই ধর্মীয়গোষ্ঠীটি ক্রমশ একটি 'জাতি' হয়ে উঠতে চেষ্টা করে। এই চিন্তাধারার, বস্তুত আধুনিক ইহুদিবাদের প্রধান প্রবক্তা থিওডর হার্জেল বিশ্বাস করতেন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা সেমিটিজ্‌ম-বিরোধী কার্যকলাপ ও মানসিকতা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ইউরোপের ইহুদিদের কোনো দিন পাশ্চাত্য সমাজের প্রধান ধারার মধ্যে মিশে যাবার সুযোগ দেওয়া হবে না বা তাদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকবে না— একমাত্র নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র জাতি-রাষ্ট্র গড়ে তোলা ছাড়া তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রথমে এই চিন্তা ছিল মূলত ইউরোপের ইহুদিদের চিন্তা, তৎকালীন ইহুদিবাদ ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার মিলিত রসে জারিত হবার ফলে তাদের মধ্যে অ-ইউরোপীয়দের তুলনায় পাশ্চাত্যের 'শ্রেষ্ঠত্ব'-এর মানসিকতাও দৃঢ়ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাদের এই স্বতন্ত্র জাতি-রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবে প্রথম মাটি খুঁজে পেয়েছিল ১৯১৭-তে বেলফোর ঘোষণার মধ্যে, যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশদের সাহায্য করার বিনিময়ে প্যালেস্টাইনে একটি 'স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র'-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তখন প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের কী হবে বা তারা কোথায় যাবে সেকথা কিন্তু কেউ মাথায় রাখে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাস্তব অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে তাদের উপনিবেশগুলিকে রাজনৈতিকভাবে যখন স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়, তখন প্যালেস্টাইনও ছিল এই সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে। ১৯৪৭-এ ব্রিটিশরা প্যালেস্টাইন ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিবাদীরা সেখানে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় স্থায়ীভাবে তাদের 'পবিত্র ভূমি' সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তারা অনেক আগে থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে দলে দলে প্যালেস্টাইনে গিয়ে বসবাস শুরু করে। সেই ১৯২০'র দশকে তারা গড়ে তোলে একটি গোপন সশস্ত্র বাহিনী 'হাগানা' (আত্মরক্ষা)। একটি ইহুদি ছায়া-সরকার পর্যন্ত গঠিত হয় এবং তার বিভিন্ন দপ্তর আগে থেকেই কাজ শুরু করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাগানা বাহিনী ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়ে বিপুল অভিজ্ঞতাও অর্জন করে। অন্য দিকে *আর্গুন জোয়েই লেউমি* ও *লেহি* প্রভৃতি চরমপন্থী ইহুদিবাদী গোষ্ঠীগুলি চালাতে থাকে খুন, বোমা নিক্ষেপ, কিডন্যাপিং, ভীতিপ্রদর্শন ও নানাবিধ অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ। যুদ্ধ চলার সময় ফ্যাসিস্ট জার্মানি ইহুদিদের যে বীভৎস গণহত্যাকাণ্ড চালায়, তার প্রেক্ষিতে স্বভাবতই তাদের প্রতি ব্যাপক সহানুভূতি গড়ে উঠেছিল সারা পৃথিবীতে। তাকে পুঁজি করে ক্রমশক্তিমান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া ইহুদিদের রাষ্ট্র গড়ার পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ মদৎ দিতে থাকে। ফলত তাদের চাপে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৪৭-এর ২৯ নভেম্বর প্যালেস্টাইনকে দ্বিখণ্ডিত করে ইহুদি ও আরবদের দু'টি আলাদা দেশে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। আরবরা স্বভাবতই তার বিরোধিতা করে। প্রায় সাথে সাথেই সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ইহুদি সশস্ত্র বাহিনী তৈরিই ছিল, তারা এসে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দখল নিতে শুরু করে। এমনকি আরবদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত তারা দখল করতে থাকে। ১৯১৭-তে

প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ড ছিনতাই

১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইনে আগত ইহুদীদের অধিকৃত অঞ্চল (সাদায়) | ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল রাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চল (সাদায়) | বর্তমানে ইজরায়েল রাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চল (সাদায়)

প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ হাজার মতো। ১৯৪৮-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় সাড়ে ছ' লক্ষে। আর আরব অধিবাসীদের সংখ্যা ৭ লক্ষ থেকে কমে দাঁড়ায় মাত্র ২ লক্ষ। ১৯৪৮-এর ১৪ মে ওয়ার্ল্ড জিওনিস্ট অর্গানাইজেশনের প্রধান বেন গুরিয়ন ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা করেন, এবং পরের দিনই সরকারিভাবে ইসরায়েল জন্ম নেয়। সেদিন থেকেই শুরু হয় আরব-ইসরায়েল ধারাবাহিক, কখনও ঘোষিত, কখনও অঘোষিত যুদ্ধ। আজ পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে ইহুদিরা তাদের জন্য রাষ্ট্রসংঘ-নির্ধারিত ভূখণ্ড ছাড়িয়ে দখল করে নিয়েছে ওয়েস্ট ব্যাংক, সিনাই উপদ্বীপ, গাজা ভূখণ্ড ও গোলান হাইট্স প্রভৃতি আরব ভূমি। (*ইসরায়েলের উদ্ভব সম্পর্কিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য* : ১) 'The birth of Israel', The History of Israel, Tim Llewellyn, BBC News, 27April, 1998(http://news.bbc.co.2/hi/middle_east/middle_east/middle_east/middle_east/78601.stm); ২)http://uprootedpalestinians.blogspot.in/2010/05/birth-of-israel.html(http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7860.stm); ৩)http://en.wikipedia.org/wiki/Israel)। এই লেখায় মুদ্রিত মানচিত্রটি থেকে তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

ইহুদিবাদ ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার মিলিত রসে জারিত ইহুদিবাদের মধ্যে অন্যদের তুলনায় পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে তাদের 'শ্রেষ্ঠত্ব'-এর মানসিকতাও দৃঢ়ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। সেই চিন্তার ধারাবাহিকতা সদ্যগঠিত রাষ্ট্র ইসরায়েলের কার্যকলাপে প্রথম থেকেই সুব্যবস্থিতভাবে কার্যায়িত হতে শুরু করে। এভাবে ইসরায়েল জাতিবৈষম্য-ভিত্তিক দক্ষিণ আফ্রিকার মতো পরিণত

হয় আরেকটি 'পাশ্চাত্যবাদী' জাতি-রাষ্ট্র, যারা কিন্তু অনুসরণ করছিল পুরানো ধরণের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা ও নীতিসমূহ। সমস্ত সম্ভাব্য পন্থায় তারা এই নতুন রাষ্ট্রের মূল অধিবাসী প্যালেস্টাইনিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ চালাতে থাকে এবং একই ধারায় দু'পক্ষকে মেলাবার চেষ্টা না করে ক্রমশ তাদের কার্যত একটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে আবদ্ধ রেখে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণে রাখার চক্রান্ত চালায়। প্রথমে তো তারা প্যালেস্টাইনিদের অস্তিত্বই অস্বীকার করতে শুরু করে। ১৯৬৯-তে এই মানসিকতাই প্রতিফলিত হয় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার ১৫ জুন, ১৯৬৯-এর এই ঘোষণায়: ''প্যালেস্টাইনি বলে কিছু নেই-ই, তাদের কোনো অস্তিত্বই নেই... কেননা প্যালেস্টাইনের আরবদের কোনো জাতি-রাষ্ট্রই কোনো দিন ছিল না।'' সাথে সাথে শুরু হয়েছিল তাদের মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করে পশুবৎ বিবেচনা করা এবং সেরকম আচরণ করা।তাই প্যালেস্টাইনিদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিভিন্নসময়ে ইসরায়েলি নেতারা কখনও তাদের বলেছেন: 'দুই-পায়ে হাটা পশু' (মেনাচেম বেগিন), 'গঙ্গাফড়িং' (য়িৎঝ্যাক শামির), 'কুমির' (এহুদ বারাক), 'আরশুলা' (র‍্যাফেল ঈতান)। ইসরায়েলিরা তাদের ছেলেমেয়েদেরও এই মানসিকতায় দীক্ষিত করে তুলেছে তাদের শৈশবকাল থেকে শিক্ষাক্রমের মধ্যে দিয়ে। সংবাদ-মাধ্যম তাতে মদৎ দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্যালেস্টাইনিদের অস্তিত্বের লড়াইতে আখ্যা দিয়েছে 'সেমিটিজ্‌ম-বিরোধী' বলে। ফলত অধিকাংশ ইসরায়েলি চায়— প্যালেস্টাইনিরা প্যালেস্টাইন ছেড়ে চিরতরে চলে যাক। প্যালেস্টাইনিরা তা না করায়, যখন তখন, বিশেষত প্যালেস্টাইনিরা সামান্যতম প্রতিরোধে ব্রতী হলে তো বটেই, 'আত্মরক্ষা'র ধুয়ো তুলে ধরে ইসরায়েল হাজার গুণ আগ্রাসন ও অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দেয়। আর এটাই হচ্ছে প্যালেস্টাইনিদের উপর ইসরায়েলিদের অতীতের হাজার হাজার আক্রমণের মতো সাম্প্রতিক গাজা আক্রমণের পটভূমিকা। এবারে ইসরায়েলি নতুন চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনিদের রকেট ছোঁড়ার অজুহাতে ব্যাপকতম আক্রমণের প্রেক্ষিতে ইসরায়েলি নেতাদের মুখনিঃসৃত কিছু সুভাষিতবলীর দিকে তাকালেই তাদের লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে : ''গাজার সমস্ত রাস্তাঘাট ও জলসরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে হবে, যাতে তাদেরকে মধ্যযুগে ছুঁড়ে ফেলা যায়'' (এলি য়িশাই- বর্তমান সহ-প্রধানমন্ত্রী); 'গাজায় কোনো নির্দোষ লোক নেই... সমস্ত গাজাবাসীকে বিনা দ্বিধায় সাবাড় করতে হবে (মাইকেল বেন আরি, সংসদ-সদস্য); গাজায় এমন ব্যাপক বোমা বর্ষণ করতে হবে যাতে সেখানকার সমস্ত লোক মিশরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় (ইসরায়েল কাৎজ, বর্তমান পরিবহণমন্ত্রী এবং আভি ডিক্টার। অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষামন্ত্রী)। আর হাজার হাজার ইসরায়েলি নাগরিক মিছিল করে স্লোগান তুলেছে: ''ওদের বাঁচিয়ে রাখার যুক্তি নেই; ওদের সবাইকে মেরে ফেলো, শিশুদেরকেও; সবাইকে তাড়িয়ে দাও'')। ইসরায়েল যখন রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল, তখন ঘোষণা করা হয়েছিল : ''আমরা শুধু করছি আলোর দিশারী হবার জন্য''। আসলে তারা যে পথে চলেছে তাতে তারা বাস্তবত হয়ে উঠেছে 'অন্ধকারের দিশারী'!

এই পটভূমিকাতেই এবার আমরা আসবো ইসরায়েলের সাম্প্রতিক গাজা ভূখণ্ডে আক্রমণের ঘটনায়। ১৯৪৮-এ রাষ্ট্রসংঘের যে সিদ্ধান্তমতো ইসরায়েল রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল, সেই অনুসারে গাজা অঞ্চলটি আরব এলাকার অন্তর্ভূক্ত, কোনোক্রমেই তা ইসরায়েলের অধীনে আসার কথা নয়। কিন্তু ক্ষমতামদমত্তরা রাষ্ট্রসংঘের আলোচনায় পাওয়া সুবিধে নিয়েই ক্ষান্ত হয় না, তাছাড়াও গায়ের জোরে অনেক বেশি দখল নিতে চেষ্টা করে। এভাবেই ইসরায়েল কারও সমালোচনা বা নিন্দায় কান না দিয়ে গাজা ভূখণ্ড দখল করে নেয় বিগত শতকের ষাটের দশকে। তিন দশক পর ১৯৯৩-এ গাজাকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্যালেস্টাইন জাতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু ২০০৬ থেকে আবার ইসরায়েল আবার গাজাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তারপর ২০০৮-এ নতুনভাবে শুরু করে ব্যাপক আক্রমণ, প্রায় এক বছর ধরে। ফলে অন্তত তেরোশো মানুষ প্রাণ হারান। স্বভাবতই প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ বার বার সুস্পষ্ট দাবি জানিয়েছে : কোনো সামরিক লক্ষ্যের উপর নয়, বরং অসহায় সামরিক মানুষদের উপরেই আক্রমণ চলেছে, তারাই মারা গেছেন। যথোপযুক্ত ওষুধপত্রের অভাবে আহতদের চিকিৎসা পর্যন্ত করা যায়নি। ইসরায়েল কোনো তথ্য-প্রমাণ দিয়ে সেই দাবির সত্যতা নাকচ করতে পারে নি। স্বভাবতই প্যালেস্টাইনিরা তার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে দখলদারি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই। তবু ইসরায়েল তাদের আগ্রাসী অবস্থান বজায় রেখেছে। এমনকি দু'বছর আগে গাজায় আক্রান্তদের মেডিক্যাল সাহায্য দিতে যাওয়া আন্তর্জাতিক জলযানে পর্যন্ত তারা বোমাবর্ষণ করেছে। তারপর মিশরের মধ্যস্থতায় আপাত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও ইসরায়েলের ইতস্তত হানাদারি চলতেই থাকে। এবং এবার তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রধান মদৎদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় আক্রমণের প্রাথমিক প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে। 'মেঘস্তম্ভ' (ইসরায়েলের গাজা আক্রমণের সাঙ্কেতিক নাম) শুরু হবার এক মাস আগে অক্টোবরের ১৮ তারিখে ইসরায়েলে শুরু হয় ইসরায়েল-মার্কিন যৌথ সামরিক মহড়া। এতে মার্কিন পক্ষ থেকে অংশ নিয়েছিল ইসরায়েলে মজুত এক হাজার এবং তৎসহ মার্কিন সিক্সথ ফ্লিট ও ইউরোকম্যান্ডের আড়াই হাজার সৈন্য। স্বয়ং মার্কিন বিমানবাহিনীর লেফটেনান্ট জেনারেল ক্রেগ ফ্র্যাংকলিন প্রত্যক্ষভাবে তো ছিলই, তাছাড়া সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ছিল

ইউরোকম্যান্ডের প্রধান সেনাধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল জেমস স্টাভ্রিডিস। মহড়ার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল কাছাকাছি দেশ থেকে (গাজা, ইরান...!) ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করে তোলা। স্টাভ্রিডিসের স্বীকৃতি অনুসারে, ''মহড়ার লক্ষ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া, যাতে মার্কিন দেশকেও প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়ে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়াতে হতে পারে।'' এই সময়কালেই, ২৪ অক্টোবর, গাজা থেকে রকেট ছোঁড়া হয়েছে— এই অভিযোগ তুলে ইসরায়েল গাজায় বোমাবর্ষণ করে চারজন অসামরিক নাগরিককে হত্যা করে। প্রায় এক মাস ধরে চলা এই মহড়া শেষ হয় ১৪ নভেম্বর গাজায় আক্রমণ শুরু হবার সময়। বস্তুত এই মহড়া কার্যত ছিল গাজায় ইসরায়েলি আক্রমণেরই ড্রেস-রিহার্সাল।

তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও অবশ্যই বলা দরকার। গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের এই আক্রমণ বস্তুত আর একটি বৃহত্তর মার্কিন-ইসরায়েল যৌথ আক্রমণেরও প্রস্তুতি। ইরানের বিরুদ্ধে। ইসরায়েলের আর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরান অভিযানের সময় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলাপ-আলোচনার মুখ আগে থেকেই অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, এবং আক্রমণ শুরু হলে গাজার দিক থেকে কোনো বিরোধিতা বা অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা। সঙ্গে সঙ্গে ইসরায়েলের রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান অশান্তি ও দ্বন্দ্বের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। মনে রাখা দরকার, ২০০৮-এও আরবদের আক্রমণ চালানো হয়েছিল সেদেশে ভোটের ঠিক আগে, আগামী জানুয়ারিতে। এবারের আক্রমণের পিছনেও সেই একই উদ্দেশ্য থাকার সমূহ সম্ভাবনা।

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি: গাজা ভূখণ্ড থেকে ক্রমবর্ধমান হারে প্যালেস্টাইনি সন্ত্রাসবাদীরা রকেট ছুঁড়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধেই তাদের এই অভিযান। মুস্কিল হচ্ছে, গাজায় ইসরায়েলের সাম্প্রতিক আক্রমণের আগের এক বছরে গাজা থেকে একটিও রকেট ছোঁড়ার অভিযোগ করা হয় নি। এমনকি সেদেশের সংবাদ-মাধ্যমগুলি পর্যন্ত স্বীকার করেছে সম্প্রতি সেখান থেকে রকেট হানা অনেক কমে গিয়েছে। স্পষ্টতই প্রমাণ হয়ে গেছে, ইসরায়েলের দাবি ডাহা মিথ্যে। তাছাড়া, প্যালেস্টাইনে ক্ষমতাসীন হামাস গোষ্ঠীর নেতৃত্বের সঙ্গেই গত এক বছর ধরে তারা দীর্ঘকালীন যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছে। অথচ ১৪ নভেম্বর তাদের প্রথম আক্রমণের প্রথম শিকার হয়েছেন সেই আলোচনায় প্যালেস্টাইনের পক্ষের প্রধান আলোচনাকারী প্যালেস্টাইনের সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল কম্যান্ডার আহমেদ জাবারি। জানা গেছে, নির্দিষ্ট-লক্ষ্য আধুনিক হেলফায়ার বোমা বর্ষণ করেই তাকে খুন করা হয়েছে। অথচ এই হামাস গোষ্ঠীকেই আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ট্রয়ের ঘোড়া বানিয়ে তখন প্যালেস্টান মুক্তি আন্দোলনের ঐক্যমত্য নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিল সেই প্যালেস্টানি লিবারেশন ফ্রন্টের বিরুদ্ধে ইসরায়েল চক্রান্তের জাল বুনেছিল। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

ইসরায়েলের এবারকার সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে তাদের স্থল, জল ও বিমানবাহিনী মিলিতভাবে ১৪ নভেম্বর থেকেএক নাগাড়ে সাত দিন ধরে। সরকারি স্বীকৃতিমতো মৃতের সংখ্যা অন্তত ১৭০, গুরুতর আহত প্রায় দেড় হাজার। আক্রমণ চালানো হয়েছে ড্রোন হামলা, এফ-১৬ বোমারু বিমান ও ট্যাঙ্ক থেকে ক্রমাগত গুলিবর্ষণের মাধ্যমে। এমনকি নিরাশ্রয় অসহায় মানুষদের শরণার্থী শিবিরে পর্যন্ত মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে। নির্বিচারে বোমা, গুলি ও ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয়েছে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অসামরিক এলাকায়। হাসপাতালে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের বেশির ভাগই শিশু ও নারী। ইসরায়েল সন্ত্রাসবাদীদের সামরিক ঘাঁটিতেই শুধু আক্রমণ চালিয়েছে — তাদের ও তাদের মার্কিনী মদৎদাররা এই দাবি যে একেবারেই মিথ্যে তা প্রমাণ করে দিয়েছে আক্রমণে মৃত অসহায় মানুষগুলি, যাদের অধিকাংশই শিশু ও মহিলা। স্বভাবতই, 'আত্মরক্ষা'র তাগিদেই ইসরায়েল এই গাজা অভিযান শুরু করেছে— এই দাবির সামান্যতম বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। বস্তুত সারা পৃথিবীতে তাদের প্রধান ও কার্যত একমাত্র মদতদার ও সহযোগী মার্কিন সরকার ছাড়া আর কেউই তাদের সেই মনগড়া কাহিনী বিশ্বাস করে নি। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সারা পৃথিবী জুড়ে।

আর বিশ্বব্যাপী বিরোধিতার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ মিলেছে গত ২৯ নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে। বিশ্বপ্রভুত্বের দাবিদার মার্কিন শাসকচক্রের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে মোট ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে ১৩৮টি ভোট দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম প্যালেস্টাইনের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে। ভোটদানে বিরত থেকেছে ৪৩টি দেশ, আর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে মার্কিন ও ইসরায়েল-সহ মাত্র ৯টি দেশ। এমনকি ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি পর্যন্ত এবার জনমতের তীব্রতা উপলব্ধি করে মার্কিন দেশের পক্ষে দাঁড়ায় নি। আর এটাই ইতিহাসের রসিকতা যে, আজ থেকে ৬৫ বছর আগে এই দিনটিতেই ইসরায়েল রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

সবশেষে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হবে। প্যালেস্টাইনের জনগণ দীর্ঘ দিন ধরে সাম্রাজ্যবাদের মদৎপুষ্ট উগ্র ধর্ম-ও-জাতি-দাম্ভিক ইসরায়েলের প্রতিনিয়ত আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসেবে এই স্বীকৃতি সে লড়াইয়ের পথে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও, এখনও অনেক রক্ত ও চোখের জল তাদের ঝরাতে হবে মূল লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য। এবং এ লড়াইয়ে বিশ্ব-জনমত যে তাদের পক্ষেই মূলত আছে ও থাকবে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

প্রবন্ধ

বর্তমান ইউরোপের চালচিত্র

সুচরিতা সেন

দুই দশক আগে বার্লিন প্রাচীরের পতনের পর ফুকুয়ামা সগর্বে ঘোষণা করলেন, ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। পুঁজিবাদের সব প্রবক্তা ও প্রতিনিধিরা বিজয় গর্বে মত্ত হলেন। তার পর যখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন তৈরি হলো, ইউরোপ মহাদেশের বহু দেশে একই মুদ্রা চালু হলো, লোকে তখন ভাবল বুঝি স্বর্গরাজ্যই এসে গেল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এমন ইউরোপীয় ঐক্য আর দেখা যায় নি। এবার ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেনে আর কোনো বাধা রইল না। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল, বিষয়টা এত সহজ নয়। প্রথমত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন নামক বস্তুটির রূপ কী হবে, তা আদৌ স্পষ্ট ছিল না। এটি একটি অতি বৃহৎ রাষ্ট্র, যাকে বলে Super State, না কি কোনো অর্থনৈতিক জোট, কমন মার্কেট? সদস্যদের পারস্পরিক দায়দায়িত্ব কী? United States of Europe কি United States of America-র সমান? ফ্লোরিডা বিপদে পড়লে ওয়াশিংটনের তার দায়িত্ব না নিয়ে উপায় নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়নের তথাকথিত রাজধানী ব্রাসেলসের তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা দেখা যায় না। তাছাড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার এতগুলি দেশকে সাত তাড়াতাড়ি জোয়ালে বাঁধা সহজ নয়। তার প্রমাণ হাতে হাতে মিলেছে।

ইউরোপে এখন সর্বব্যাপী সংকট। সংকট সর্বত্র ঠিক সম পর্যায়ের নয়। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডসের অবশ্য বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (trade surplus) আছে, ঋণের বোঝাও খুব বেশি নয়। যদিও, আমরা দেখব, তারাও খুব স্বস্তিতে নেই। কিন্তু দক্ষিণ ইউরোপের চারটি দেশ, পর্তুগাল, ইতালি, গ্রীস, স্পেন, সংক্ষেপে PIGS (নামের অন্য এক অর্থ আছে, যা খুব মধুর নয়)— গভীর সংকটে। গ্রীস তো ভূমধ্যসাগরে ডুবন্ত। সংকটের নানা দিক ও কারণ থাকলেও মূল ব্যাপার এই রকম। অর্থনীতির তেজি পর্বে পশ্চিম ইউরোপের ব্যাংকগুলি, বিশেষত ব্রিটিশ, ফরাসি ও জার্মান ব্যাংক জমি বাড়ির (real estate) বাজারে প্রচুর টাকা ঢেলেছিল। বেপরোয়া ভাবে ধার দিয়েছিল। বাড়ির বুদবুদ (housing bubble) ফেটে যাওয়ার পর তারা বিপদে পড়ল। যাকে বিপন্ন দেশকে, বিশেত দক্ষিণের দেশগুলিকে, সাহায্যদানের উদারতা বলে দাবি করা হচ্ছে, প্রকৃত পক্ষে তা জনগণের দেওয়া করের অর্থে ব্যাংকগুলির উদ্ধারকার্য (bail out)। আর তার বিনিময়ে সাধারণ মানুষকে পেটে শক্ত করে গামছা বাঁধতে হচ্ছে। অথচ সরকার ও মিডিয়ার ভাব, ওরাই যেন এত দিন আমোদ-ফূর্তি করে টাকা উড়িয়েছে, এখন তার খেসারত দেবে, এটাই ন্যায্য। ব্যাংকের আমানতে যেন হাত না পড়ে। আমজনতার অবস্থা কাহিল। আত্মরক্ষার হাতিয়ারও কম। যারা এতদিন পশ্চিম ইউরোপের জনগণের স্বার্থ দেখত, কমিউনিস্ট দলগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রমুখ, তারা নানা কারণে, সাংগঠনিক ও মতাদর্শগতভাবে দুর্বল হয়ে গেছে। সোশ্যালিস্ট বা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলি, যারা অনেক দেশে ক্ষমতায় আছে, তারা নিও-লিবারালিজমকে মেনে নিয়েছে। তবু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ প্রতিবাদ প্রতিরোধ করছে। এ অবস্থায় যতটা সম্ভব। কয়েকটি দেশের খণ্ড চিত্র দেখা যাক।

জার্মানি: "আমরা কি গ্রীসের চেয়ে খুব বেশি ভাল আছি?"

জার্মানি আজ ইউরোপের সব চেয়ে ধনী ও শক্তিশালী দেশ। বলতে গেলে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ইঞ্জিন। সেই জোরে অন্যদের ওপর ছড়ি ঘোরায়। কে কী করবে, অনেকটা ডিক্টেট করে বলা যেতে পারে। বিসমার্ক, দ্বিতীয় উইলিয়াম, হিটলার অস্ত্র-বলে যা পারেন নি, বর্তমান জার্মান চ্যান্সেলর বা রাষ্ট্রনায়ক এঞ্জেলা মার্কেল পেরেছেন অর্থনৈতিক পেশী-বলে। আর সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানিকে গ্রাস করার গর্ব তো আছেই। মার্কেল নিজে ছিলেন পূর্ব জার্মানির এক ধর্মযাজকের কন্যা। অতএব কট্টর নিও-লিবারাল। বাম বিদ্বেষী, শ্রমিক বিদ্বেষী। মার্কেলের বক্তব্য, দক্ষিণ ইউরোপের লোকেরা অলস, অকর্মণ্য, উড়নচণ্ডী। তারাই কাজ না করে আর দেদার খরচ করে এই সংকট ডেকে এনেছে। তার দাম তারাই দিক। কর্মঠ, সংযত-চরিত্র জার্মানদের ওপর অন্যদের বোঝা চাপানো কেন?

কিন্তু সত্যিই কি জার্মানি বাকি ইউরোপের জন্য অনুকরণীয় মডেল হতে পারে? এক নজরে দেখা যাক উত্তর রাইনল্যান্ড অঙ্গরাজ্যটিকে। এখানে প্রধান শিল্প, বিখ্যাত ওপেল মোটর। অধুনা মার্কিন বহুজাতিক জেনারেল মোটর্সের ফ্রানচাইজ প্রাপ্ত। ওপেল মাঝারি সাইজের গাড়ি দেশে বিদেশে সরবরাহ করে। কিন্তু ইদানিং গাড়ির বাজার মন্দা। যেখানে প্রতি বছর ২৫০,০০০ গাড়ি অন্তত বানানোর কথা, সেখানে ২০১২ সালে তৈরি হয়েছে মাত্র ১৬০,০০০। তাও সব বিক্রি হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সব দায় চাপাতে চাইছে শ্রমিক কর্মীদের ঘাড়ে। ব্ল্যাকমেল চলছে— ইউরোপের সর্বত্র— হয় আমরা যা বলি সব মেনে নাও, নয়তো ঝাঁপ বন্ধ করে তোমাদের রুটি রুজি বন্ধ করব। মজুরি ফ্রিজ করা হয়েছে। গড় পেনশন, যা আগে প্রায় ৪০০ ইউরো ছিল, কমে হয়েছে তার অর্ধেক। গরমের ও বড়দিনের ছুটি কমানো হয়েছে।

হেমে একটা ছোট শহর। ওপেল কারখানার শ্রমিক কর্মীরা অনেকেই এখানে বসবাস করেন। বা বলা যায়, প্রাক্তন কর্মীরা।

কারণ সব শর্ত মেনে নেওয়ার পরও অনেকেই ছাঁটাই হয়েছেন। অনেকের ভাগ্যে জুটেছে যাকে বলে 'মিনি জব'। আধা-সময়ের কাজ। মজুরি অনেক কম। কাজের কোনো নিশ্চয়তা নেই। সর্বোচ্চ মাইনে মাসে ৪০০০ ইউরো। মালিকরা যৎসামান্য খরচ করে সামাজিক ব্যয় বা সোশ্যাল সিকিউরিটি বাবদ। হেমে শহরের ১১,০০০ জন এরকম মিনি জব করে। গোটা জার্মানিতে এরা ৯০ লক্ষ।

আর এক ধরনের কর্মীকে দেখা যায় যাদের নাম Aufstocker। যারা জমায়। কী জমাবে ওরা? হয়তো কাজ বা সময়। জমাবার মতো টাকা নেই। ওরা নির্ধারিত নিম্নতম মজুরির তুলনায় কম পায়। সে টাকাও হয়ত আসে ঢের আমলাতান্ত্রির হাঙ্গামা হুজ্জুতের পর। হেমে শহরে আনুমানিক ৩৪০০ জন Aufstocker আছে। শহরের একজনের মন্তব্য, এদের অস্তিত্ব সামাজিক সম্পর্ককেই বিষাক্ত করে তুলেছে।

কয়েক বছর আগে পাশ করা অত্যন্ত অপছন্দের আইন Hartz-8 অনুসারে, যারা বেশ কিছুদিন বেকার আছে, তারা যে কোনো মজুরিতে যে কোনো কাজ নিতে বাধ্য। না হলে বেকারভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই দক্ষ শ্রমিকদের দেখা যায় ঝাড়পোঁছের কাজ নিতে। এটা শ্রমের মর্যাদা, না অবমূল্যায়ন? অনেক সময় বেকারভাতা ও সোশ্যাল সিকিউরিটিতেও পারিবারিক খরচ কুলোয় না। কোনো প্রাক্তন শ্রমিককে দেখা যায়, ঝোলা কাঁধে পথে নেমে প্লাস্টিক, টিনের টুকরো কুড়িয়ে নিচ্ছে, বেচার জন্য। একাংশকে নির্ভর করতে হয় সোশ্যাল সিকিউরিটি ছাড়াও বেসরকারি দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর। রেড ক্রস ইত্যাদি সংস্থা এমন লোকদের জন্য যাকে বলে 'স্যুপ কিচেন' খুলেছে। বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ন্যূনতম খাদ্য বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা সস্তা জামাকাপড় ডিসকাউন্টে বেচা হয়। হেমে শহরের এক কাউন্সিলার ভেরোনিকা, Die Livle বা বাম দলের সদস্য, মন্তব্য করেছেন, আমরা কি গ্রীসের তুলনায় খুব ভাল অবস্থায় আছি?

এর মধ্যেই একটু আশার আলো। জার্মান ধাতু শ্রমিকদের প্রধান ইউনিয়ন I G Metall আন্দোলনের পথ ধরেছিল। ২০০০ থেকে শুরু করে এই শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি প্রায় ৭ শতাংশ কমেছে। অন্তত যেটুকুর জন্য ক্ষতিপূরণ পাওনা। বাভারিয়া রাজ্যের (এমনিতে বেশ রক্ষণশীল) রাজধানী মুনশেন বা মিউনিখ শহরের ধাতু শ্রমিকরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে পথে নামলেন— "৬.৫ শতাংশ। ওটা আমাদের ন্যায্য পাওনা।" সরকার ও মালিকপক্ষের ভয় ছিল, যদি ৩ মিলিয়ন সদস্য সমৃদ্ধ I G Métall দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনিশে মে তারিখে দুই পক্ষের এক রকম আপস রফা হলো। মজুরি বাড়ল ৪.৩ শতাংশ। তরুণ কর্মীদের নিয়মমতো প্রমোশনের ও স্থায়ী কাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। বামপন্থী কাগজ Judge Welt (তরুণ পৃথিবী) দাবি করল, এই রফা তরুণদের জয়। সবাই অবশ্য খুশি হলো না। আরো দাবি ও প্রত্যাশা ছিল। তবু দুঃসময়ে যথা লাভ।

পেনশন ব্যবস্থার আংশিক বেসরকারিকরণের দরুন সমস্যা আরো বেড়েছে। যারা আলাদা বন্দোবস্ত করতে পারেনি, তারা স্বস্তিতে নেই। হেমেতে প্রতি ৫ জনের ১জন দারিদ্র্যসীমার নীচে বা কাছে।

ফ্রান্সের লক্ষ্মী-লাভ

অনাবাসী ভারতীয় শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তাল ভারতীয় মিডিয়ার চোখে এক 'আইকন'। বিহারের সামান্য অবস্থা থেকে ইংল্যান্ডে গিয়ে কোটিপতি বনে তিনি নাকি দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ইকনমিক টাইম্‌স এইভাবে তাঁর গুণগান করেছিল— Lakshmi, Come Back। অর্থাৎ লক্ষ্মী মিত্তাল আর ধনদেবী লক্ষ্মী সমার্থক। মিত্তাল যে দেশে বিচরণ করবেন, লক্ষ্মী সেখানে অচল থাকবেন। যেমন কিনা ছিলেন জগৎ শেঠের ঘরে। এ বিষয়ে ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা দেখা যাক।

আর্সেলির-মিত্তাল সম্ভবত ফ্রান্সের বৃহত্তম ইস্পাত কোম্পানি। তার প্রেসিডেন্ট লক্ষ্মী মিত্তাল। শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে তিনি খুব একটা জনপ্রিয় নন। তাঁর বিরুদ্ধে ফরাসি শ্রম আইন ভঙ্গের অভিযোগও উঠেছে। সম্প্রতি তিনি ফ্লরাঁজ শহরে ব্লাস্ট ফার্নেস বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তার দরুন ৬৩০ জন শ্রমিক কর্মী রুটি রুজি হারাতো। ফরাসি সরকারের বক্তব্য, তা হবে না। বরং গোটা কোম্পানি আর কাউকে বেচে দেওয়া হোক। এমন কোনো শিল্পপতি, যিনি ফার্নেস খোলা রাখতে রাজি। মুশকিল হলো, মিত্তাল নিজের কোম্পানিক অলাভজনক অংশ বিক্রি করতে রাজি, কিন্তু লাভজনক অংশ নয়। অথচ কেকের টোপ না দেখালে কে আর চিরতার রস খাবে! ফরাসি শিল্প পুনর্জীবন (Industrial Renewal) মন্ত্রী বেপরোয়া মানুষ। ধনপতিদের খুব একটা গ্রাহ্য করেন না। হয়ত সাবেক আমলে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের এক বিন্দু রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবহমান। তিনি সরাসরি মিত্তালকে মিথ্যাবাদী ও ব্ল্যাকমেলার বলে গাল দিলেন। এর আগেও তিনি অন্য শিল্পপতিদের সাথে এভাবে কথা বলেছেন। মঁতবুর হুমকি দিলেন, বেচতে রাজি না হলে মিত্তালের কোম্পানি জোর করে জাতীয়করণ করা হবে (তার পরে বেচে দেওয়া হবে অন্য এক শিল্পপতির কাছে, যিনি কর্মীদের পেটে লাথি মারবেন না)। এই সম্ভাব্য ধনপতি ক্রেতা কে, তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছিল। কেউ কেউ বলছিল, মোটেই ও রকম কোনো ক্রেতা নেই। মঁতবুর মিত্তালের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এক খড়ের পুতুল খাড়া করছেন।

যাই হোক, শ্রমমন্ত্রীর প্রস্তাবে দুই বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। শ্রমিক কর্মীরা খুশি হলো। ছড়ি ঘোরানো মালিক মিত্তালকে তারা আদৌ পছন্দ করত না। অন্য দিকে সরকার পড়ল উভয়

সংকটে। নয়া জমানার সোশাল ডেমোক্র্যাটরা জাতীয়করণের পক্ষপাতী ছিল না। এতে নাকি অনেক ঝামেলা, আইনগত ও অন্যান্য জটিলতা। অথচ শ্রমিকদের দাবিও ফেলার নয়। ইতিমধ্যে ফ্লরাইঞ্জের বেশ কিছু শ্রমিক কর্মী প্যারিসে এসে তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন, মিটিং মিছিল শুরু করে দিয়েছিল। শেষে সরকার এমন এক সমাধান বার করল, যাতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না। ব্যাপারটা এই রকম। ইউরোপের ১৫টি দেশে ৪৫টির মতো সংস্থা এক সবুজ বা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি নিয়ে একটি প্রকল্প চালু করেছিল। নাম ULCOS (Ultra Low Carbon Dioxide Steelmaking)। এমন ভাবে ইস্পাত তৈরি হবে যে কার্বন এমিশন ও পরিবেশ দূষণ হবে অনেক কম। ঠিক হয়, আর্সেলর-মিত্তাল কোম্পানি এই প্রকল্পের সাথে যোগ দেবে। যতদিন না কাজ চালু হচ্ছে, ফার্নেস বন্ধ থাকবে। তবে তার দেখভাল করা হবে, যাতে যে কোনো মুহূর্তে চালু করা যায়। ছাঁটাই করা শ্রমিকদের ততদিন অন্যত্র নিযুক্ত করা হবে।

এই চুক্তিতে ফরাসি সরকার খুশি। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, এক ঢিলে তিন পাখি শেষ হয়েছে। কারোর চাকরি গেল না, দেশের ইস্পাত শিল্প মার খেল না, আবার নতুন সবুজ প্রযুক্তি মিললো। কথাটা একেবারে ভুল নয়। তবে যা বলা হয়নি, এতে সব চেয়ে বেশি লাভ হলো মিত্তালের। তিনি কথা দিয়েছেন, এই প্রকল্প বাবদ পাঁচ বছর ধরে ১৮০ বিলিয়ন ইউরো দেবেন। ফরাসি সরকার বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে দেবে ১৫০ বিলিয়ন ইউরো। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন নামে যে গৌরী সেন, সে সরবরাহ করবে বাকিটা। অর্থাৎ মিত্তাল একটি ঝকঝকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি-সম্পন্ন কারখানা পাবে, তার মাত্র অর্ধেক বা সিকি খরচ নিজের পকেট থেকে দিয়ে। লক্ষ্মী-লাভই বটে।

শ্রমিক কর্মীরা অসন্তুষ্ট। তারা আশা করেছিল, এই সুযোগে মিত্তালের বজ্রমুষ্ঠি থেকে ছাড়া পাবে। মঁতবুর জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, কিন্তু তিনি লড়ে যাবেন। বলা বাহুল্য, মিডিয়া ও ব্যবসায়ী মহল তাঁর ওপর খাপ্পা। মঁতবুরকে মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় দেওয়ার জন্য চাপ আছে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ওপর। তাঁরা এখনো পর্যন্ত তা পারেন নি, কারণ দলের মধ্যে এই মানুষটির কিছু সমর্থনের ভিত্তি আছে। দেখাদেখি আরও কিছু সংস্থার শ্রমিক কর্মীরা জাতীয়করণের দাবি তুলেছেন। যেমন, কোরিয়ান মালিকানাধীন জ্যাঁ লাজ্যাঁ, বন্ধ হওয়ার মুখে পেট্রোপ্লাস। ইউরোপের সাবেক বাম শক্তিরা কী পরিমাণে দক্ষিণপন্থী হয়ে গেছে, মিত্তাল কাহিনী তার প্রমাণ।

ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থাও দারুন ভালো নয়। এ বছরের তৃতীয় ভাগে (third quarter) অর্থনীতি মন্দার কান ঘেঁষে গেছে। বেকার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। দেশে বিদেশি বিনিয়োগ অর্ধেক হয়ে গেছে।

স্পেন : একটি অঞ্চলের ভবিষ্যৎ

স্পেনের অবস্থা ভালো নয়। ব্যাংকিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে স্পেনীয় ব্যাংকদের ধারদেনার পরিমাণ ৩১৬ বিলিয়ন ইউরো। সুদ বেড়ে হয়েছে ৬.৫ শতাংশ। সেই পুরনো কাহিনী। জমি-বাড়ির ফাটকাবাজির জন্য বেহিসেবি টাকা ধার দেওয়া, তারপর বুদবুদ ফেটে গেলে লালবাতি জ্বালা। স্পেনের ব্যাংকগুলির 'খারাপ', অর্থাৎ প্রায় অপরিশোধ্য ঋণের বহর এখন ১৪৪ বিলিয়ন ইউরো। আর তিন লাখ পরিবার মাথার ওপর থেকে ছাদ হারিয়েছে। এই সুযোগে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাপিয়ে দিতে চাইছে আরো বেশি কৃচ্ছ্রসাধনের বোঝা। গত বছর বাজেট ঘাটতি ছিল ৮.৫ শতাংশ। এ বছর তা কমিয়ে আনা হচ্ছে ৫.৯ শতাংশে। বলা বাহুল্য, সবটাই হবে আম জনতাকে আরো মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে, তাদের ঘাড় ভেঙে।

এরই মধ্যে উত্তর-পশ্চিম স্পেনে আস্তুরিয়াজ অঞ্চলে খনি শ্রমিকরা জুন মাসে আন্দোলনে নেমেছে। ১৯৩৪ সালে এই খনি শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রামকে বলা যেতে পারে গৃহযুদ্ধের পূর্বাভাস। সম্প্রতি খনিদের যে খয়রাতি দেওয়া হত (subsidy) তা ৬৪ শতাংশ কমানো হয়েছে। ফলে গোটা অঞ্চলে খনি শিল্প এখন বিপর্যয়ের মুখে। অবশ্য খনি শিল্পের আগেকার বোলবোলাও আর নেই। যেখানে ৪৫,০০০-এর বেশি শ্রমিক কাজ করত, সেখানে এখন বড় জোর ৮,০০০। তবু আরো ৩০০,০০০-র পরোক্ষে কর্মসংস্থান হতো। প্রায় লাখ ছয়েক মানুষ কোনো না কোনো ভাবে এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। এমন নয় যে সরকারের হাত একেবারে খালি খনিগুলির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। দু-তিনটি বড় বিদ্যুৎ সংস্থা এ সব খনি থেকে জ্বালানি নেয় বা নিতে আগ্রহী। আর সরকার তো সেদিনই বিরাট পরিমাণ অর্থ ঢেলে ব্যাংক বেল আউট করল।

আস্তুরিয়াজ-এর খনি শ্রমিকরা জঙ্গি আন্দোলনে নেমেছে। মিটিং মিছিল পথ অবরোধ, সবই চলছে। কয়েক হাজার মানুষ রাজধানী মাদ্রিদ পর্যন্ত গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি বিপ্লবীর মতো রাজপথে ব্যারিকেড তুলছে। আস্তুরিয়াজ-কে বাঁচাতেই হবে।

পর্তুগাল: ত্রিশ বছরে এমনটি দেখা যায় নি

এগারোই ফেব্রুয়ারি পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে তিন লাখ লোকের একটি মিছিল বেরিয়েছিল। এমনটা না কি এ দেশে গত ত্রিশ বছরে দেখা যায় নি। সংগঠক জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, CGTP, যারা পর্তুগিজ কমিউনিস্ট দলের কাছাকাছি। পার্টির বক্তব্য: পর্তুগালে খেটে খাওয়া মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তার পেছনে আছে ত্রয়ী। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ECB আর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার। গত বছর বা তারও আগে থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছিল। চেষ্টা করা হয়েছিল, দৈনিক কাজের সময় আধ ঘন্টা

বাড়ানোর। প্রবল প্রতিবাদের জোয়ারে সে প্রচেষ্টা ভেঙ্গে গেছে। কাজের সময় বাড়ানোর চেষ্টা অন্যত্রও হয়েছে। যেমন জার্মানিতে।

এবার তো আরো চমৎকার। একটি প্যাকেজ চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে পড়ে মালিক পক্ষের ছাঁটাই করার অবাধ অধিকার, নমনীয় কাজের সময়, মজুরি ও ওভারটাইমের মূল্য কমানো— এমনিতেই তা যথেষ্ট কম। এমনকি শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে আলাপ আলোচনা করা ও চুক্তি করার অধিকারকে (collective bargaining)-কেও প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করানো হয়েছে। সোশালিস্ট দলের সাথে ঘনিষ্ঠ UGT ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এসবের অনেকটাই মেনে নিয়েছে। তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে CGPT-র সেক্রেটারি আর্মেনিও বার্নস। আলাপ আলোচনা হবে সংগঠনের নিচ তলা থেকে।

গ্রীস: সব কিছু ভাড়া দেওয়া হচ্ছে

পশ্চিমা সভ্যতার জন্মস্থান গ্রীস এখন সংকটগ্রস্ত। ইউরোপের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশ। রাজধানী আথেন্সে সর্বত্র নোটিশ টাঙানো: ভাড়া দেওয়া হবে। দোকানপাট অর্ধেক খালি। অথচ ছোট ছোট মেয়েরা পথেঘাটে টুকটাক জিনিস বিক্রি করছে, প্রধানত টুরিস্টদের। এজন্যই বোধহয় বলে, মন্দার সময় আরো বেশি মানুষ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢোকে। কী ভাবে ঢোকে, সেটাই কথা।

জুনের নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী দলের জোট কান ঘেঁসে জিতেছে। 'বেল আউট'-এর বিনিময়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কৃচ্ছ্রসাধন। ধনীদের ওপর কর কিন্তু বাড়েনি। অবশ্য 'বেল আউট' কোনো মহত্বের পরিচয় নয়। আমরা দেখেছি, প্রকৃত পক্ষে বেল আউট করা হয়েছে জার্মান, ব্রিটিশ আর ফরাসি ব্যাংকগুলিকে। কৃচ্ছ্রসাধনের দরুন অর্থনীতির কোনো লক্ষ্যণীয় উন্নতি হয়নি। কিন্তু জনজীবনে তার কুপ্রভাব স্পষ্ট। ১১ মিলিয়নের দেশে দেড় মিলিয়ন বেকার। কেবল রাজধানী আথেন্সেই লাখ পাঁচেক। আগে মাসিক বেকার ভাতা ছিল ৪৪০ ইউরো। গত বছরের মার্চ থেকে তা কমে হয়েছে মাত্র ৬০ ইউরো। এও কৃচ্ছ্রসাধনের অঙ্গ। অনেকেই বাড়িভাড়া আর বিদ্যুতের বিল দিতে পারছে না। ইনস্টলমেন্টে কেনা অনেক বাড়ি ব্যাংকরূপী মহাজন দখল করতে ব্যস্ত। মজুরি প্রায় তৃতীয় বিশ্বের স্তরে, অথচ মূল্যমান প্রথম বিশ্বের কাছাকাছি। কোনো টুরিস্ট যদি প্রশ্ন করে, কেমন আছো, তার একটাই উত্তর— Very bad।

তবু সাধারণ মানুষ, শ্রমিকশ্রেণী সাহসী ও লড়াকু। গ্রীক কমিউনিস্ট দল ছোট কিন্তু সক্রিয়। সেরিসা নামে ঢিলেঢালা বাম দলও আছে। যদিও নির্বাচনের সময় তারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। গত বছর দুয়েকে বার বার জঙ্গি ধর্মঘট, আন্দোলন, প্রতিবাদ মিছিল, গ্রীসকে অচল করে দিয়েছে। এই নভেম্বরেও আথেন্সে সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে।

আয়ার্ল্যান্ড: সবুজ দ্বীপে আগুন

তথাকথিত পান্না দ্বীপ আয়ার্ল্যান্ডের অবস্থা অনেকটা গ্রীসের মতো। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। আয়ার্ল্যান্ড কোনো উড়নচণ্ডী রাষ্ট্র ছিল না। বরং নিষ্ঠাভারে মাত্রসট্রিক্ট চুক্তির নিয়ম মেনে চলেছে। বাজেট ঘাটতি মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩ শতাংশ অতিক্রম করে নি। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত আয়ার্ল্যান্ডের অর্থনৈতিক গতি ছিল দুর্বার। পূর্ব এশিয়ার "বাঘদের" সাথে মিলিয়ে তার নাম হয়েছিল "কেলটিক বাঘ"। এই সময় ব্যাংকগুলি রিয়েল এস্টেটের ফাটকা বাজারে বেপরোয়া ঋণ ঢেলেছিল। বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় বাঘ যখন বেড়ালে রূপান্তরিত হলো, তখন ব্যাংকগুলির নিজস্ব অবিমৃষ্যকারিতার ফল থেকে বাঁচাবার জন্য তার ভার চাপিয়ে দেওয়া হলো সাধারণ মানুষের উপর। যেমন হয়েছে সর্বত্র।

আয়ার্ল্যান্ডের নিম্নমুখী গতি অব্যাহত। মোট উৎপাদন ২০০৮ সালে ৩.৫ শতাংশ, তার পরে ৭.৬ শতাংশ ও তারও পরের বছর ১ শতাংশ বেড়েছে। গত বছরের গোড়ার দিকে বেকার ছিল ১৪.৫ শতাংশ। কিন্তু সরকারের নজর কেবল তেলা মাথায় তেল ঢালায়। আইরিশ কর্পোরেট ট্যাক্স, অর্থাৎ সব চাইতে ধনীদের ওপর কর, মাত্র ১২.৫ শতাংশ— যা বিশ্বে নিম্নতম। তাই যখন সংকট দেখা দিল, সরকারের তেমন সঞ্চয় কিছুই ছিল না। জার্মানির মার্কেল ও ফ্রান্সের সারকোজির মতো রক্ষণশীল নেতারাও পরামর্শ দিয়েছেন, এই সংকটে কর্পোরেট ট্যাক্স কিছুটা বাড়াতে। আইরিশ নেতারা তা করেন নি। উল্টে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে যেটুকু কড়ি ছিল, সেই জাতীয় পেনশন ফান্ড ভেঙে ১৭ বিলিয়ন ইউরো দিয়েছেন ব্যাংক বেল-আউট বাবদ। ব্যাংকগুলির যা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা কম, এমন ঋণ অর্ধেক মূল্যে কিনে নিয়েছেন। এসবের ফলে সংকটের আঁচ ধনীদের গায়ে তেমন লাগে নি। আর বিশ্বের পুঁজির (financial asset) মধ্যে ৩০৭ বিলিয়ন ইউরো আইরিশ ধনপতিদের হাতে। এই সম্পত্তির বহর ২০০৮-০৯ এর মধ্যে বেড়েছে ৭.১ শতাংশ। এক্ষেত্রে ৫০টি দেশের মধ্যে আয়ার্ল্যান্ডের স্থান অষ্টম। দেশের সবচেয়ে ধনী ৩০০ জনের মিলিত সম্পত্তি ২০১০-১১ সালের মধ্যে বেড়েছে ৬৬৭ বিলিয়ন ইউরো। বোঝা কঠিন নয়, কর্তারা আম জনতার গলায় ছুরি বসিয়ে লগ্নি পুঁজি ও ধনকুবেরদের সেবায় অক্লান্ত। রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র প্রকট।

মে মাসের শেষে আয়ার্ল্যান্ডে গণভোটের মাধ্যমে আর্থিক চুক্তির (fiscal pact) পক্ষে রায় দিয়েছে। ফলে বাজেট আরো সংকুচিত হবে, বাড়বে কৃচ্ছ্রসাধন। ধনীদের জন্য নয়, আম-জনতার জন্য। এই রায় কিছুটা অপ্রত্যাশিত। প্রায় সবাই ধরে নিয়েছিল, গণভোট চুক্তির বিপরীতে যাবে। মিডিয়া পর্যন্ত স্বীকার করছে, এই ফলের অন্তরালে আছে চাপ সৃষ্টি, 'ব্ল্যাকমেল'।

এর পর ১৮ পৃষ্ঠায়

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতিশ্রুতি কার্যত বাতির করল সরকার

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরে বর্তমান ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা পরিষেবার হাল এককথায় ভয়াবহ। কোনো বেসরকারি সংস্থা নয়, খোদ সরকারি নানা প্রতিবেদনেই বারবার এই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা উঠে এসেছে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে নতুন গণতন্ত্রের কর্ণধার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জাতির উদ্দেশে যে বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেন—

> ...দেশের সেবা মানে ভারতবর্ষের কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের সেবা। এর অর্থ দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অসুস্থতার অবসান এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ। আমাদের সর্বাপেক্ষা উচ্চাশা হল প্রতিটি চোখ থেকে অশ্রুজল মুছিয়ে দেওয়া। হয়ত তা বর্তমানে আমাদের সাধ্যাতিরিক্ত, কিন্তু যতদিন অশ্রুজল ও যন্ত্রণা থাকবে, ততদিন আমাদের কাজ শেষ হবে না।

অথচ বর্তমান পরিস্থিতিটা কী দাঁড়িয়েছে? অবশ্যই বিভিন্ন স্বাস্থ্যসূচকের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর থেকে অনেক উন্নতি করেছে। নবজাতক শিশুমৃত্যুর হার (IMR) স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ছিল প্রতি হাজারে প্রায় দেড়শোর কাছাকাছি। তা বর্তমানে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ৪৬-এ। মায়েদের মৃত্যুহার (MMR) প্রতি লক্ষে বর্তমানে ২১২ জন, যা ১৯৪৭ সালে ছিল প্রায় আটগুণ। গড় আয়ু আটত্রিশ বছর থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬৪ ও ৬৬ বছরে। ১৯৫৩ সালে সারা দেশে ম্যালেরিয়া রোগীর আনুমানিক সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি—মৃত্যু আট লক্ষ। ২০০৭ সালে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ছয় লক্ষ, মৃত্যু মোটামুটি সাতশো। প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শিশুকে সম্পূর্ণ টীকাকরণের আওতায় আনা গেছে। ভয়াবহ গুটিবসন্ত রোগ সারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকেও নির্মূল হয়েছে। পক্ষাঘাতকারী (Paralytic) পোলিও রোগও প্রায় বিলুপ্তির পথে।

এই ধরনের আরও অনেক পরিসংখ্যান দেওয়া যেতে পারে। অতএব বলা যাবে না যে, ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আদৌ কোনো উন্নতি হয় নি। কিন্তু বিষয়টা হলো বিগত ছয়টি দশকে আমাদের দেশ যতটা উন্নতি করেছে, অন্যান্য বহু দেশের অগ্রগতি তার চেয়ে অনেক বেশি। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির কথা ধরছি না। তৃতীয় বিশ্বের এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশও ভারতের থেকে অগ্রগামী। মনে রাখতে হবে, ক্রয়ক্ষমতার সমতার নিরিখে (Purchase Power Parity) ভারতবর্ষ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। মনে রাখতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের পরেই ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনী সর্ববৃহৎ। নিয়মিত বাহিনীতে ফৌজির সংখ্যা তেরো লক্ষ। আধাসামরিক বাহিনী যুক্ত করলে সাতচল্লিশ লক্ষের বেশী। মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইজরায়েল ও যুক্তরাজ্য ও ফরাসি দেশের থেকে যুদ্ধাস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। বোয়িং কোম্পানি থেকে সাম্প্রতিক অতীতে যে দশটি গ্লোবমাস্টার যুদ্ধবিমান কেনা হয়েছে অন্তরীক্ষ যুদ্ধের উপাদান হিসাবে, তাদের মোট দাম, যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণের মোট খরচ ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য বাজেটের প্রায় দেড়গুণ। নব্বই-এর দশকের আর্থিক সংস্কারের পর বিশ্বের দ্রুততম প্রবৃদ্ধির দেশের একটি ভারতবর্ষ, যে রাষ্ট্রপুঞ্জে স্থায়ী সদস্যপদের প্রত্যাশী ও এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দেশ হবার জন্য চীনের প্রতিস্পর্ধী। চন্দ্রাভিযানে তার আগ্রহ। পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজের সামরিক শক্তি বারবার প্রকাশ করেছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি।

অথচ এখনও ভারতবর্ষে প্রতিবছর চার লক্ষ শিশুর অন্তিম নিঃশ্বাস একদিন বয়স হবার আগেই বাতাসে মিলিয়ে যায়। পাঁচ বছরের নীচে শিশুমৃত্যু বছরে বিশ লক্ষ—বিশ্বে সর্বাধিক। গাণিতিক হিসাবে প্রতি ১৫ সেকেণ্ডে একটি শিশুর মৃত্যু ঘটে। এদের মধ্যে অর্ধেকের বয়সই একমাসের কম।

প্রতি দশ মিনিটে একজন প্রসূতি মায়ের মৃত্যু ঘটে এই গণতন্ত্রে। ২০১০-১১ সালে মোট ৫৭০০০ গর্ভবতীর মৃত্যু হয়েছিল— যাদের অধিকাংশেরই কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল না। সহস্রাব্দের ঘোষণায় (MDG) মায়েদের মৃত্যু ২০১৫ সালের মধ্যে কমে প্রতি লক্ষে ১০০-তে দাঁড়ানোর কথা। ২০১২ সালের অবসানে বর্তমানে তা প্রতি লক্ষে ২১২। ১৯৯০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে মায়েদের মৃত্যুহার কমেছে ৪৭ শতাংশ, অথচ ভারতবর্ষে কমেছে ৩৮ শতাংশ।

২০০৫ সালের প্রথম ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (National Rural Health Mission) চালু করেন, তাতে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা অলভ্যতার বহু ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। ঐ নথিতে বলা হয়েছে চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যান। সারা দেশে কৃষি ঋণের পরেই চিকিৎসার জন্য ঋণ সর্বাধিক। একজন গড় ভারতবাসী হাসপাতালে ভর্তির জন্য তাঁর বার্ষিক আয়ের ৫৮ শতাংশ খরচ করতে বাধ্য হন। সারা বিশ্বের সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতবর্ষে চিকিৎসার জন্য একজন রোগীকে প্রায় ৮৫

শতাংশ খরচ নিজের পকেট থেকে দিতে হয় (Out of Pocket Expense)—যা মালদ্বীপে ১৪ শতাংশ, ভুটানে ২৯ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ৫০ শতাংশ ও থাইল্যান্ডে ৩১ শতাংশ। এই ব্যয়ের ৭২ শতাংশ-ই যায় ঔষধ কিনতে। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা যা আছে তা মূলত শহরে কেন্দ্রীভূত এবং ধনীদের জন্য পক্ষপাতিত্বপূর্ণ (Urban and pro-reach)। নীচের দু-একটি সারণি বিশ্বের অন্যান্য দেশের নিরিখে আমাদের অবস্থান বুঝতে পাঠকদের সাহায্য করবে।

বিশেষজ্ঞ ঐ উচ্চপর্যায়ের কমিটিতে ছিলেন, যাদের অনেকেই প্রথিতযশা চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্য কর্মী, সমাজতাত্ত্বিক বা অর্থনীতিবিদ। সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলার সুপারিশ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সবচেয়ে সুদক্ষভাবে ব্যবহার, সমস্ত নাগরিকদের জন্য জীবনদায়ী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধের জোগান সুনিশ্চিত করা, টীকাদান ও চিকিৎসা সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তি তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়া এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা (Community Participation) এইসব ছিল এই কমিটির বিবেচনাধীন বিষয় (Terms of Reference)।

সারণি ১

স্বাস্থ্যসূচক	*ভারত*	*চীন*	*ব্রাজিল*	*শ্রীলঙ্কা*	*থাইল্যান্ড*
এক বছরের নিচে শিশুমৃত্যু (প্রতি হাজারে)	৪৬	১৭	১৭	১৩	১২
পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যু (প্রতি হাজারে)	৬৬	১৯	২১	১৬	১৩
টীকাকরণ (%)	৬৬	৯৫	৯৯	৯৯	৯৮
প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা প্রসব (%)	৪৭	৯৬	৯৮	৯৭	৯৯

ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর সমস্ত রোগব্যাধির ২০% বহন করে, যার মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক রোগের সংখ্যা সর্বাধিক। সারা পৃথিবীর সমস্ত শিশুমৃত্যুর ২৩%, প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর ২০%, ৩০% যক্ষ্মা রোগী, ৬৮% কুষ্ঠ রোগী এদেশে। প্রতিবছর ৮ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয় উদরাময়ে। এমনকি মধুমেহ, উচ্চরক্তচাপ প্রভৃতি অসংক্রামক রোগেও আমরাই পৃথিবীতে প্রথম। এককথায় বললে, ''গুণতে গেলে গুণের নাহি শেষ।''

এই অবস্থার 'পরিবর্তনের জন্য' দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (12th plan) অধীনে 'সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা'-র লক্ষ্যে (Universal Health Care) এক উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি (High Level Expert Group) গঠন করা হয়, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. কে শ্রীনাথ রেড্ডির সভাপতিত্বে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং আপামর ভারতবাসীর জন্য ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সুপারিশ করাই এই কমিটির গঠনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল। পনেরো জন

সারণি ২

দেশ	*জিডিপি-র নিরিখে স্বাস্থ্যখাতে খরচ*	*সমস্ত সরকারি খরচের নিরিখে স্বাস্থ্যখাতে খরচ*
ভারত	৪.১%	১.৪%
শ্রীলঙ্কা	৭.৩%	২.১%
চীন	১০.৩%	২.৫%
থাইল্যান্ড	১৪%	৩.৩%

দীর্ঘ পর্যালোচনা এবং অনুসন্ধানের পর বিশেষজ্ঞ কমিটি গতবছর নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তাঁদের বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন।

প্রথমেই মুখবন্ধে বলা হয় যে, সর্বজনীন স্বাস্থ্যপরিষেবা সমানভাবে সমগ্র জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আয়, সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সরকারকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে। এই পরিষেবা থেকে কাউকেই বাদ দেওয়া চলবে না (Non exclusion)। পরিষেবা হতে হবে প্রয়োজন-ভিত্তিক, দায়িত্বশীল ও আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে (Need based, responsible & affordable) সর্বোত্তম।

সারণি ৩

দেশ	*প্রতি হাজার মানুষে চিকিৎসক*
ভারত	০.৬
শ্রীলঙ্কা	০.৭
চীন	১.৬
যুক্তরাজ্য	৫.৪
যুক্তরাষ্ট্র	৫.৫
কিউবা	৫.৯

সরকার নিযুক্ত এই বিশেষজ্ঞ কমিটি দেখেছেন যে ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা তলানিতে এসে ঠেকেছে এবং চিকিৎসা পরিষেবার অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিকীকরণের ফলে বিপুল

সংখ্যক রোগী ও তাঁদের পরিবারবর্গ আর্থিক দিক থেকে বিপর্যয়কারী অভিঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, পরিভাষায় যাকে বলে Catastrophic shock।

উচ্চপর্যায়ের এই কমিটির পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে যে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর ৩৫% চিকিৎসা খরচা মেটাতে গিয়ে দারিদ্রসীমার অন্ধকারে তলিয়ে যান। তাঁদের ভিটেমাটি বন্ধক পড়ে বা বিক্রি হয়ে যায়, অস্থাবর সম্পত্তি-গয়নাগাঁটি-গরুবলদ বেচে দিতে হয়, মেয়ের বিয়ে পিছিয়ে যায় ইত্যাদি প্রভৃতি। শহরের ২০% ও গ্রামের ২৮% মানুষের চিকিৎসা করাবার জন্য আদৌ কোনো টাকাপয়সা নেই। বহির্বিভাগ বা ভর্তি হবার খরচ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার দাম (Diagnostic Costs) ঔষধের মূল্য অন্যদের সর্বস্বান্ত করে দেয়। গ্রামের দিকে অবস্থা বেশি ভয়াবহ। শহরে প্রতি দশ হাজার মানুষে ১১.৩ জন ও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন, গ্রামে সংখ্যাটা দশ হাজারে ১.৯।

এবার এই কমিটির সুপারিশগুলির চুম্বক সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রথম পরামর্শই হচ্ছে সমস্ত নাগরিকদের জন্য নিঃশুল্ক ওযুধের সরবরাহ। আপাতভাবে অসম্ভব বা অলীক মনে হলেও বিশেষজ্ঞ কমিটি দেখিয়েছেন যে, যদি স্বাস্থ্যখাতে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) মাত্র ০.৩ শতাংশ বাড়ানো যায়— তাহলেই এটা সম্ভব। পাশাপাশি চালু করতে হবে নানা অবৈজ্ঞানিক ও রকমারি বাণিজ্যিক নামের (ব্র্যান্ড নাম) ওযুধকে বাতিল করে বর্গনামে (নন-প্রপ্রিয়েটরি নাম) ওযুধ লেখার ব্যবস্থা। বাজার থেকে ওযুধ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রয়োজনে বেসরকারি ওযুধ বিক্রেতাদের সঙ্গে চুক্তি করা যেতে পারে, যারা ঐসব ওযুধ রোগীদের সরবরাহ করবে ও পরে সরকারের থেকে মূল্য ফেরত পাবে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বাস্তবায়িত করতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেটের ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২.৫ শতাংশ করতে সুপারিশ করা হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে তা নিয়ে যেতে হবে জিডিপি-র তিন শতাংশে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বাড়াবার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি সাধারণভাবে 'স্বাস্থ্যকর' চালু করার কথা বলেছে। যেমন, সর্বশিক্ষা অভিযানের জন্য সেস চালু করা হয়েছে। নানাদেশের মতো চাকুরিজীবীদের বেতন থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য কেটে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জিডিপি-র তুলনায় করের অনুপাত বর্তমান ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশে নিয়ে যেতে পারলে স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাবে। অপরপক্ষে যদি চিকিৎসার জন্য পকেট থেকে খরচ না করতে হয়, তাহলে বেতন থেকে ঐ বাধ্যতামূলক অবদান (ম্যানডেটরি কনট্রিবিউশন) গায়ে লাগবে না।

এরপর বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাব হল সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমস্ত স্তর থেকে পরিষেবার জন্য টাকা নেওয়া (ইউজার্স ফি) তুলে দেওয়ার— কেননা প্রথমত এর ফলে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষেরা সরকারি হাসপাতালে আসতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, এই মূল্য সংগ্রহ করার জন্য সঠিক পরিকাঠামো প্রায় কোথাওই নেই এবং পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংগৃহীত অর্থ ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়নি।

কেন্দ্রীয় সরকার অর্থের যোগান বাড়াবেন, কিন্তু সেই সুযোগে যেন রাজ্য সরকারগুলো তাদের অনুদান কমিয়ে না দেয়। স্বাস্থ্য বাজেটের ৭০ শতাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় (প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার) ব্যয় করতে হবে— দ্বিতীয়/তৃতীয় স্তরের পরিষেবায় দামি দামি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য নয়। বেশ কিছু রাজ্য সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার আর সম্প্রসারণ না ঘটিয়ে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকার (মাথাপিছু) একটি স্বাস্থ্য বিমা করিয়ে দিচ্ছে নাগরিকদের নামে। যেন বিমার প্রিমিয়াম দেওয়ার মাধ্যমেই সরকারের দায়দায়িত্ব খালাস হয়ে গেল। কিন্তু এই পরিষেবা নেওয়ার জন্য মানুষকে প্রায় সবক্ষেত্রেই যেতে হচ্ছে বেসরকারি নার্সিং হোম বা কর্পোরেট হাসপাতালের কাছে— যাদের মধ্যে অনেকেরই ব্যবসা হচ্ছে রুগীকে প্রতারণা করা। ফলে সামান্য অসুখেই ছলচাতুরি করে ঐ ৩০ হাজার টাকা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অপ্রয়োজনে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত এই ব্যবস্থা কেবল হাসপাতালে ভর্তির জন্য। বহির্বিভাগের রোগীরা দেখাবেন কোথায়? বিশেষজ্ঞ কমিটি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বলেছে, সরকারের তরফে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেনবার অধিকার বিমা কোম্পানিদের দেওয়া যাবে না। এছাড়াও কালক্রমে ইএসআইসি, সিজিএইচএস এবং অন্যান্য সরকারি পরিষেবার বিলুপ্তি ঘটিয়ে একটি ব্যবস্থাই বলবৎ করার কথা বলেছেন ঐ বিশেষজ্ঞরা।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্তর্বস্তু হলো: প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের "হেলথ প্যাকেজ" বা ন্যূনতম পরিষেবা যা দিতে সরকার বাধ্য থাকবেন। সম্পন্ন নাগরিকরা এর উপর মূল্য দিয়ে বেসরকারি বিমা কিনতে পারেন, বেশি দামের শয্যায় ভর্তি হতে পারেন এবং আরও দামী পরিষেবা নিতে পারেন। কিন্তু সমস্ত ধরনের অসুখ-বিসুখ, অস্ত্রোপচার, প্রসব প্রভৃতির ন্যূনতম পরিষেবা প্রতিটি নাগরিক বিনামূল্যে পাবেনই। তা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। এই পরিষেবা সরকার নিজের হাসপাতালে দিতে পারে। অথবা (পরিকাঠামোর ঘাটতি মেটাতে) যেসব বেসরকারি হাসপাতাল চুক্তি করবে— সেখানেও পরিষেবা দিতে পারে। বেসরকারি হাসপাতালের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। চিকিৎসার পুরো খরচ সরকার মিটিয়ে দেবে। সেজন্য ঐসব হাসপাতাল রোগীর কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করতে পারবে না, অর্থাৎ সুনিয়ন্ত্রিত 'পিপিপি' মডেলের কথা বলা হয়েছে।

'উন্নততর' পরিষেবার নামে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যাপক বেসরকারীকরণের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে রিপোর্টে। যে যে বিষয়গুলিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা হল—

- সর্বজনীন পরিবেশ
- সমবন্টন
- বিভাজন না করা বা কোনো মানুষকেই বাদ না দেওয়া
- আর্থিক সুরক্ষা
- রোগীর অধিকার সুনিশ্চিত করা; রোগীর পছন্দ, পরিষেবা নেবার ক্ষমতা ও স্থায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর জোর দেওয়া
- জনস্বাস্থ্যকে পুনর্গঠিত ও দৃঢ়বদ্ধ করা
- দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা
- সামাজিক অংশগ্রহণ।

বলাই বাহুল্য যে, এর প্রায় সবকটিই এখন সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় অনুপস্থিত।

উপভোক্তাদের থেকে পরিষেবার দাম নেবার বিষয়ে (Users' Fee) বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার মহানির্দেশক ডা. মার্গারেট চানকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে—

> Users' Fee for healthcare was put forward as a way to recover costs and discourage the excessive use of health services and the over consumption of care. This did not happen. Instead, Users' Fee punished the poor.

এই বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বলেছেন:

> We propose that every citizen should be entitled to essential primary, secondary and tertiary healthcare services that will be guaranteed by the central government. The range of essential healthcare servives offered as a National Health Package (NHP) will cover all commmon conditions and high impact, cost effective healthcare interventions for reducing health related mortality and disability.

যোজনা কমিশনের সিদ্ধান্ত : নাকের বদলে নরুণ

প্রাথমিকভাবে গত মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বিশেষ কমিটির সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন। যদিও কিভাবে এই লক্ষ্য পূরণ করা হবে সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ ছিলেন। আমরা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ বা 'পিপিপি' মডেলের বিরোধী। কারণ সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে 'পিপিপি' কার্যত (যেখানে রোগীদের client বা খরিদ্দার বলে হামেশাই উল্লেখ করা হয়) সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত যৌথ উদ্যোগের কথা বলেছেন এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে। শর্ত রাখা হয়েছে, যে সব বেসরকারি হাসপাতাল সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেবার জন্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন এবং সরকার সেই চিকিৎসার ব্যয় মিটিয়ে দেবেন— সেইসব হাসপাতাল ঐ একই পরিকাঠামো ব্যবহার করে ব্যবসা চালাতে পারবেন না। সেজন্য তাঁদের অন্য হাসপাতাল বাড়ি ও পরিকাঠামো রাখতে হবে। কেননা বিশেষজ্ঞ কমিটির সমীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে, একই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (Health Establishment) সরকারি ব্যয়ে নিঃশুল্ক ব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থের বিনিময়ে ব্যবসা চলছে নানা ছুতো-নাতায় নিঃশুল্ক পরিষেবা পাওয়া উচিত এমন রোগীদের থেকেও প্রচুর টাকা আদায় করা হয় এবং সরকারি তহবিল হাতিয়ে নেওয়া (Siphoning) হয়। কিন্তু সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সরকারি পরিকাঠামোর অভাবের জন্য 'আপাতত' এই সুপারিশ করা হয়েছে। এটি বাদ দিলে বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্য সুপারিশগুলি বর্তমান অবস্থায় যথেষ্ট জনমুখী বলেই আমাদের ধারণা।

এই রিপোর্ট পেশের পর স্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধছিল যে, 'এত ভালো ভালো নয়।' কেন্দ্রীয় সরকার বা যোজনা কমিশন কি বেসরকারিকরণ-উদারিকরণ-বিশ্বায়নের বিপ্রতীপে হেঁটে আদৌ এইসব সুপারিশ কার্যকর করবেন? স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যোজনা কমিশনের চূড়ান্ত ও গৃহীত রিপোর্টে সেই সন্দেহই সত্যে পরিণত হল। নানা ভালো ভালো কথার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে শ্রীযুক্ত মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বাধীন যোজনা কমিশন কার্যত খারিজ করল সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্ভাবনা এবং জনস্বাস্থ্যের আরও বেসরকারিকরণের পথে এক রূপরেখা পেশ করল। কীভাবে, তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বলছি।

২০১২ সালের ৮মে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব গুলাম নবী আজাদ উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটির সমস্ত সুপারিশ গ্রহণ করে বিবৃতি দেন। কিন্তু ৮ মে ২০১২ 'টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ায়' প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, জুলাই মাসে যোজনা কমিশন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যে চূড়ান্ত খসড়া পেশ করেছে তাতে এই কমিটির জনমুখী সুপারিশগুলিকে কার্যত খারিজ করে আরও বেশি বেসরকারিকরণ ও কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের উৎসাহদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথমত যোজনা কমিশন জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় বাজেটের ২.৫ শতাংশ নয়, বর্তমানে যোজনা কমিশন স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে বাজেটের ১.৫৮ শতাংকে লক্ষ্যমাত্র বলে স্থির করেছে। যোজনা কমিশনের আরও প্রস্তাব, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হবে রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ রাজ্যে স্বাস্থ্যখাতে যে ব্যয় করে তার অধিক। সকলেই জানেন, রাজ্যগুলি থেকে কর বাবদ যে বিপুল অর্থ কেন্দ্র নিয়ে যায়, ফেরত দেয় মাত্র তার ১৫-২০

শতাংশ। অধিকাংশ রাজ্যের পক্ষে ব্যয় বৃদ্ধি অসম্ভব। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (NRHM) থেকে শুরু করে প্রায় সব জাতীয় স্বাস্থ্যপ্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা (JSSK), পরিবার পরিকল্পনা, টীকাদান, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, উদরাময় প্রভৃতির প্রতিরোধ কর্মসূচি সবই চলে কেন্দ্রীয় অর্থে। এখন রাজ্যের অংশের অর্ধেক যদি কেন্দ্রীয় অনুদান হয়, তবে ব্যয়বরাদ্দ বাড়া দূরে থাক, কমে যাবে।

দ্বিতীয়ত, যোজনা কমিশন বলেছেন, "সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিজের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ত্যাগ করে মূলত ম্যানেজার হিসাবে কাজ করবে।" বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবীমার ভূমিকায় হবে প্রধান। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও মেক্সিকোর বেসরকারি পরিষেবা ক্ষেত্রে "Managed Care System" এর উদাহরণও দেওয়া হয়েছে, যা বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের সম্পূর্ণ বিরোধী।

ত্রিস্তর বিশিষ্ট 'Health Package' এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত 'Contract out' সুপারিশের পরিবর্তে কমিশনের প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে, তা হল সরকারের (অর্থাৎ জনগণের) অর্থে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিসাধন। লাভজনক তৃতীয় স্তরের পরিষেবাকে (tertiary care) তুলে দেওয়া কর্পোরেট হাসপাতালের হাতে এবং যেটুকু সরকারি ব্যবস্থা আছে তার পাট গুটিয়ে ফেলা। এ হলো ১৯৯২ সালে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে (Structural Adjustment) বিশ্বব্যাঙ্কের পুরানো দাওয়াই।

যোজনা কমিশনের প্রস্তাব সরকারি অনুদানে সংগঠিত বেসরকারি ব্যবসাকেন্দ্রগুলি বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি নতুন চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তুলবে। প্রতিটি পরিবার তাদের পছন্দমত প্রাইভেট হাসপাতাল বেছে নেবে এবং এতটা সীমা পর্যন্ত সরকার তার মূল্য চুকিয়ে দেবে। National Health Package এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। মুখোশের আড়ালে কী ভয়ংকর প্রতারণা!

স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের আনন্দের আরও কারণ আছে। দেশে চিকিৎসকের অভাব নিয়ে নানা মায়াকান্নার পর যোজনা কমিশন ঘোষণা করেছেন প্রাইভেট হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার উৎসাহ দেবার জন্য মোট খরচের ২০ শতাংশ অনুদান দেওয়া হবে। যেসব ব্যবসায়ী সংস্থা চিকিৎসা পরিষেবা দেবে তাদের আয় বাড়াবার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। যেমন, করছাড়, সরকারি অর্থে গড়ে তোলা হাসপাতালেও 'User's Fee' ইত্যাদি। আর বিনাপয়সায় ওষুধ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বর্গ নামের ব্যবহার? সেসব সম্পর্কে যোজনা কমিশন নিশ্চুপ।

এ তো দুধের বদলে পিটুলিগোলাও নয়। কার্যত চূড়ান্ত ভাঁওতাবাজির মায়াজালে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার সমস্ত অধিকার হরণ। পাঠকরাই ভেবে দেখুন এর বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

তথ্যসূত্র :

১। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (NRHM)-এর নথিপত্র
২। উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটির (HLEG) নথিপত্র
৩। ১২ নং যোজনা কমিশনের Draft Policy
৪। Text Book of Preventive & Social Medicine–K. Parke
৫। National Health Profile 2010
৬। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও ইন্টারনেট

বর্তমান ইউরোপের চালচিত্র

১৩ পৃষ্ঠার পর

সরকার ও মিডিয়ার বড় অংশ ধুয়ো তুলেছিল, এ না হলে অর্থনীতি একেবারে শেষ হয়ে যাবে। ফলে পক্ষে পড়েছে ৬০ শতাংশ ভোট। গণভোটের বিন্যাসের মধ্যেও শ্রেণীবিভাজন লক্ষণীয়। গ্রামাঞ্চল ও স্বচ্ছল অংশে ভোট পড়েছে পক্ষে। শ্রমিক কর্মী অধ্যুষিত এলাকায় বিপক্ষে, যেমন পশ্চিম ডাবলিন।

আইরিশ রাজনীতির ওপর কি সংকটের প্রভাব পড়ছে? স্পেন বা গ্রীসের মতো না হলেও এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত ইতিবাচক। আয়ার্ল্যান্ডের প্রধান দুই দল। এরাই পালা করে দেশ শাসন করে। কিছুটা মার্কিন ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মতো। দুই দলই বেশ দক্ষিণপন্থী। তৃতীয় দল, লেবার, অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তবে একেবারে উপেক্ষনীয় নয়। বলা হয়, আড়াই দলের সিস্টেম। কোনো কোনো বিষয়ে আয়ার্ল্যান্ড প্রায় একটি Theocracy, ধর্মশাসিত দেশ। সম্প্রতি এক ভারতীয় মহিলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গর্ভপাত-বিরোধী ক্যাথলিক অনুশাসন নিয়ে তুমুল ঝড় উঠেছে। সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে লেবারের বামে যে সব ক্ষুদ্র দল, তারা কিছুটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। Congress of Irish Trade Unions কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। "সুশীল সমাজের" কিছু গোষ্ঠী মাথা তুলছে লাগামছাড়া উদারপন্থার বিরুদ্ধে। যেমন, Claiming the Future, People before Profit.

অর্থনীতির সংকট গোটা ইউরোপে যে "সুনামি" তুলেছে তাতে "ইতিহাসের শেষ" ভেসে গেছে কুটোর মতো। এই মুহূর্তে সমাধান কী হবে, তা স্পষ্ট নয়। দক্ষিণ ইউরোপের কাছে ইউরো হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা। পুরোনো মুদ্রায় ফিরে যাওয়া হয়ত অবমুল্যায়ন কিছুটা পথ দেখাতে পারত। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই পদক্ষেপও সহজ নয়। দেখা দেবে বিদেশি মুদ্রার বিপুল ঋণ। কারণ ইউরো তখন হয়ে যাবে বিদেশি মুদ্রা। তাছাড়া প্রচণ্ড ফাটকাবাজিও শুরু হতে পারে। পুঁজিবাদের রঙিন হাতছানি যে মরীচিকা তাও তো আর একবার প্রমাণিত হলো, এই মূল্য দিয়ে।

প্রবন্ধ

স্বদেশ, স্বরাজ ও স্বরাজ্য

গর্গ চট্টোপাধ্যায়

যখনই কোথায়ও কোনো বড়ো পরব বা আনন্দানুষ্ঠান হয়, তখন এমন একটা ভাব জাগতেই পারে যে, 'সমগ্র দুনিয়া' এই মুহূর্তে খুশি হয়ে এই আনন্দে সামিল। অন্তত আমাদের এমনটাই ভাবতে ভালো লাগে। এই সব মুহূর্তে চারদিকের আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও হাসির রোলের মধ্যে কারুর একলা কান্না চাপা পড়ে যায়। ভারতীয় রাজ্যসংঘের এক গোষ্ঠীর কাছে গত নভেম্বর মাসের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বারাক ওবামার বিজয় হয়ে উঠেছিল এমনই এক আনন্দ-মুহূর্ত। সারা দিনব্যাপী টিভি-র কল্যাণে সুদূর দেশের নির্বাচনী ভাষণ, ভোট গণনার উত্তেজনা, সবই এক লহমায় পৌঁছে যায় বিশ্বের অপর প্রান্তে। ওবামা মার্কিন জনগণের কাছে আরো চার বছরের জন্য ক্ষমতা চেয়েছিল, এবং তা সে পেয়েছে। এই উপমহাদেশীয় মানুষ, তা সে স্বদেশবাসীই হোক বা প্রবাসীই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরের এই গণতন্ত্র উৎসবের সাক্ষী ছিল। অনেকেই দেখেছে বা শুনেছে ওবামা'র লোক-ভোলানো 'আশা'র বাণী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশাগুলি পরবর্তী চার বছরে পূর্ণ হবে কিনা তা আলাদা কথা, তবে এই নভেম্বরেই এক সুদীর্ঘ আশাহীনতার বারো বছর পূর্ণ হলো এই ভারতীয় রাজ্যসংঘের এক অংশে। ইরম শর্মিলা চানু, সেই গান্ধী যা গান্ধী কখনই হয়ে ওঠেন নি, তাঁর প্রবাদপ্রতীম অনশনের বারো বছর পূর্ণ করলেন। এই অনশন আর্মড্ ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট (AFSPA)-এর বলে মণিপুরের মানুষদের উপর ভারতরাষ্ট্রের কর্মচারীদের অত্যাচার বন্ধের দাবিতে। তাঁর এই অনশন শেষ হয় নি, হয়তো আরো বারো বছর চলবে।

এই যে ইরম শর্মিলা চানুর বারো বছরের প্রতিবাদ, অথবা মণিপুরের মহিলাদের বিবস্ত্র হয়ে সৈন্যবাহিনীর ধর্ষণের প্রতিবাদ, এগুলো ভারতীয় রাষ্ট্রের তথাকথিত 'জাতীয় মঞ্চে' খুব একটা ছাপ ফেলে না। তার একটা কারণ হলো মণিপুরের 'নগণ্যতা'। এই যে 'জাতীয় মঞ্চ', এটা কী, কবেই বা এর উৎপত্তি, এটা বোঝা দরকার। ভারতীয় রাষ্ট্রের 'জাতীয় মঞ্চ'র এক অর্থে উদ্ভব ঘটে ১৯৫০-এর সংবিধানের মাধ্যমে ভারতকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণার পরিণতিতে। ভারতীয় রাজ্যসংঘের উদ্ভব তার কিছু পূর্বে, '৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে। যখন এই ভারত রাষ্ট্র খাতায় কলমে আদৌ প্রজাতান্ত্রিক ছিল না (অর্থাৎ '৪৭ থেকে '৫০-এর মাঝামাঝি সময়ে), তার মধ্যেই তা মণিপুরের গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত প্রজাশান্তি দলের সরকারকে ধ্বংস করার মতো কীর্তি ঘটায়। স্বাধীন মণিপুরের যে নির্বাচনে প্রজাশান্তি দল জেতে, তাতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও অংশ নিয়েছিল এবং প্রচণ্ডভাবে পরাজিত হয়েছিল। তবে 'রাষ্ট্রীয় ঐক্য' বড়ো দায়। তাই সেই মণিপুর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এলাকাটিকে ভারতীয় রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা হয়। আদি পাপ থেকে খুব বাজে ঘা তৈরি হয়। অথচ ঘা হলে ছেঁটে বাদ দেওয়া আবার 'আধুনিক জাতি রাষ্ট্র'-র পক্ষে সম্ভব নয়। ফলেই 'নগণ্য' ঘাগুলি থেকে পুঁজ-রক্ত ঝরেই চলে। শরীরের অন্যান্য অংশ তখন ব্যথা কমানোর জন্য অবশ করার কড়া ওষুধ খায়— রাষ্ট্রবাদী সরকারি/বেসরকারি পাঠ্যপুস্তক থেকে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ করতে করতে।

এই যে মার্কিন দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলো, তার পাশাপাশি আরো দু'টি নির্বাচন সেই দেশে হলো— মার্কিন কংগ্রেস ও সিনেটের নির্বাচন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিকে মনোযোগের কারণেই এই নির্বাচনগুলি সম্পর্কেও কিছু খবর দেশি মানুষের কাছে গেছে। তারই সুযোগ নিয়ে কিছু ব্যাপার বুঝে ফেলা যাক।

মার্কিন কংগ্রেস মোটামুটি ভারতরাষ্ট্রের লোকসভার মতো। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৈত্রীতন্ত্র (federalism)-এর ধারণা নিহিত আছে তার সংবিধানে, তা ভারতরাষ্ট্রের মতো মেকি মৈত্রীতন্ত্র নয়। মার্কিন আইনসভার উচ্চকক্ষ, যাকে সিনেট বলে, সেটা ভারতরাষ্ট্রের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার থেকে চরিত্রে একদমই আলাদা। ভারতরাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দুই ক্ষেত্রেই নিম্নকক্ষের সদস্যসংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক-এর মূল্য এক, এবং এমন ব্যক্তিনাগরিক দ্বারাই রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে বলে যে ধারণা, সেই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটায়। এখানে দু'টি ধারণা রয়েছে— নাগরিক এবং সমগ্র রাষ্ট্র। মাঝে আর কিছু নেই। বোঝা দরকার যে এই 'সমগ্রতা'র ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ভারতীয় রাষ্ট্র তার আজকের 'সমগ্রতা' পেয়েছে আইনের দলিলে, ভাষা-জাতি-সমাজ-আত্মপরিচিতি-নির্ভর কোনো 'জাতীয়তা'র ভিত্তিতে নয়। যেহেতু ভারতরাষ্ট্রের এহেন অন্তর্গত 'সমগ্রতা'র বাস্তব ভিত্তি বড়ো ক্ষীণ, তাই শিক্ষায়-রাজনীতিতে-সাংস্কৃতিকধারায়-সংবাদমাধ্যমে তথাকথিত এক সমগ্রতার গল্প ফাঁদা হয় নিরন্তর, প্রভূত টাকাপয়সা ব্যয় করা হয় এই প্রকল্পে। কারণ এই সমগ্রতার গল্প ফাঁদা গেলে অখণ্ডতাকে একরকম পবিত্র দায় হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে উচ্চকক্ষ, সেখানে অতীতের ভিন্নতার ও বর্তমানের বাস্তবতার, এবং ভবিষ্যতের আশা ও গতিপথের ভিন্নতা সত্ত্বেও মেলবন্ধন ঘটে এক মৈত্রীতান্ত্রিক সিনেট গঠনের মাধ্যমে। এহেন উচ্চকক্ষে প্রথমত একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে একাধিক 'রাষ্ট্র'র (মার্কিন

রাজ্য) মৈত্রীর ভিত্তিতে। এটাই মৈত্রীতন্ত্রের ভিত্তি। যেহেতু মার্কিন রাজ্যগুলি মিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছে, তাই এক্ষেত্রে সমমর্যাদা পায় প্রতিটি রাজ্য, তাদের মধ্যে জনসংখ্যার যতোই তফাৎ থাক। তাই মার্কিন সিনেটে সদস্যতার একক হলো রাজ্য— ব্যক্তিনাগরিক নয়। প্রতিটি মার্কিন রাজ্যের দু'টি করে আসন আছে মার্কিন সিনেটে। বৃহৎ রাজ্য টেক্সাস ও ক্ষুদ্র রাজ্য রোড আইল্যান্ড— দুইয়েরই সিনেটে সদস্যসংখ্যা সমান, অর্থাৎ দুই। এমন ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করা হয়। একই সাথে বৃহৎ রাজ্যগুলি দ্বারা ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বার্থহানি করা বা খবরদারি করার প্রবণতাকেও কিছুটা ঠেকানো যায়। এর ফলে সংঘরাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্যের সমান অংশীদারিত্বও থাকে।

ভারতরাষ্ট্রের যে উচ্চকক্ষ, তথাকথিত 'রাজ্যসভা', সেটি এক অর্থে লোকসভারই প্রতিরূপ— শুধু কোন্ সময় জনমত যাচাই করা হয়েছে তার তফাৎ। রাজ্যসভার ক্ষেত্রেও সদস্যতার মূল ভিত্তি হলো ব্যক্তিনাগরিক। বেশি মানুষের জন্য বেশি আসনসংখ্যা, কম মানুষের জন্য কম। স্রেফ মানুষগুলিকে রাজ্যের ভিত্তিতে ভাগ করা হলেও রাজ্যের নামে সদস্যতা চালানো হয়। রাজ্যসভার একক কিন্তু রাজ্য নয়, এও আসলে 'লোক'সভা, স্রেফ রাজ্যের নাম ব্যবহার করে, রাজ্য আইনসভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়। রাজ্যসভায় রাজ্যগুলিকে আসন বণ্টনের ভিত্তি সেই রাজ্যের জনসংখ্যা। অর্থাৎ এখানে রাজ্যগুলির যে আপন সত্তা, সেটি গ্রাহ্য হয় না, যেমনটা হয় মার্কিন সিনেটে। নাম রাজ্যসভা হলেও এটা এমন কোনো সভা নয় যেখানে আসনগুলিতে রাজগুলি বসে আছে। যে সভার একক রাজ্য নয়, তাকে রাজ্যসভা বলে আসলে মৈত্রীতন্ত্রের নামে অলীক এক 'সমগ্রতা'র বনিয়াদকেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দৃঢ় ভাবে পুঁতে দেবার কার্যসিদ্ধি হয়। ২৪৫ সদস্যের রাজ্যসভায় মণিপুরের মাত্র একজন সদস্য রয়েছে। মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, গোয়া, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরা— এই সব রাজ্যগুলি মিলে রয়েছে মাত্র সাতজন সদস্য। এই এলাকাগুলির অতীত এই অখণ্ডতার বাইরে, অন্যতর নানা কল্পনা, যোগাযোগ ও সম্ভাবনা তাতে বর্তমান। কিন্তু ভারতরাষ্ট্রের রাজ্যসভায় তাদের গুরুত্ব ওই এক সদস্য দিয়ে মাপা হয়। কোনো নৃগোষ্ঠী তাদের 'নগণ্য' মনে করে না সংখ্যার ভিত্তিতে। তাদের নিজেদের কাছে নিজেদের দাম উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যার সাথে সম্পর্কহীন। এক যথার্থ মৈত্রীতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ভারতসংঘ স্রেফ 'ভারতমাতা'র সন্তানসন্ততিদের জন্য নয়। বরং এটি অনেক মায়ের দ্বারা গঠন করা এক যৌথ পরিবার— যেখানে কোনো বাপ নেই, নেই মাতাদের মধ্যে উঁচু বা নিচু । কারণ অন্য কারোর মা আমার মায়ের থেকে কম কিছু নয়।

কল্পিত আদি ও অকৃত্রিম ঐতিহাসিক অখণ্ডতার নামে দমন-নীতির উদাহরণ পাওয়া যাবে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের অন্যত্রও। পশ্চিমদিকে চাইলে আমরা দেখবো, পাকিস্তান রাষ্ট্র 'ওয়ান ইউনিট' ব্যবস্থার নামে বেলুচিস্তানের নিজস্ব সত্তা একতরফাভাবে হনন করে। যে সময়ে বেলুচিস্তানের এই পাকিস্তানি 'সমগ্রতায়' বিলীন হওয়া, তখন পাকিস্তানেরও প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান ছিল না। চেনা ঠেকছে? বড়ো মিল এই উপমহাদেশে। এখানেই আমরা দেখি এক দগ্‌দগে ঘা, যেখান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, কখনও বেশি, কখনও কম। ফ্রন্টিয়ার কর্প হলো ভারতরাষ্ট্রের বিএসএফ গোছের। তাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়ায় এসব ঘা শুকোয় নি, বরং আরও বিষাক্ত হয়েছে। কিশোর ও যুবক বেলুচ কর্মীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার, অপহরণ, গুপ্তহত্যা, দরজায় টোকা মেরে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাজপথের পাশে চোখ খুবলে গুলি করে ফেলে রাখা— এতে আর যা-ই হোক, প্রজাতন্ত্র হয় না। নোংরা ক্ষুর দিয়ে ঘা কাটতে গেলে সারা শরীরে বিষ ছড়ানোর আশংকা থাকে। প্রতিটি নিরুদ্দেশ মানুষ, প্রতিটি চোখ-খুবলানো মুণ্ডু, প্রতিটি মুণ্ডহীন অত্যাচারিত ধড় ইসলামাবাদ থেকে প্রচারিত মানবাধিকার সম্বন্ধীয় নানা প্রচারকে বিয়োগান্ত প্রহসনে পরিণত করে। আর বিদ্রোহী বেলুচরা যদি নির্বাচনের পথও বেছে নেয়, এমন একটা ব্যবস্থায় তারা কীই বা করতে পারবে, যেখানে জাতীয় সংসদে (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) বেলুচিস্তানের আসনসংখ্যা ১০ শতাংশেরও কম? ফ্রন্টিয়ার কর্প বেলুচিস্তানের মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ও ইচ্ছেমতো 'আইনশৃঙ্খলা' রক্ষার জন্য তাদের অত্যাচার করতে পারার আইনি অনুমোদনের মেয়াদ এই নভেম্বর মাসে ফের বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এই 'আইনশৃঙ্খলা' রক্ষা সেই বৃটিশ আমল থেকে যে কোনো বিরোধিতার দাওয়াই— যার আড়ালে মানুষকে পিটিয়ে তার গা ফাটা টমেটোর মতো পিচ্ছিল করে দেওয়া যায়। যদি ফ্রন্টিয়ার কর্পের কার্যকলাপের কথা শুনে খুব চেনা ঠেকে পাঠকের, তার কারণ খাকির রং '৪৭-এর কাঁটাতারের এপারেও এক। তাদেরও রয়েছে এমনি অগৌরবের ইতিহাস, যদিও চেঁচিয়ে তা বললে ঝামেলা। এই যে অত্যাচার ও হত্যা করেও শাস্তি পাওয়ার বদলে মেডেল পাওয়া ও পদোন্নতি, এর বৃহত্তর একটি দ্যোতনা আছে। যে কারণে খাকিদের হাতে পাকিস্তানে সরফরাজ শাহ-র হত্যা বা মণিপুরের ব্যস্ত রাস্তায় দিনদুপুরে এএফএসপিএ-র আড়ালে তেরঙা খাকির চংখাম সঞ্জিতকে হত্যার ফলে কারও পেনসন আটকাবে না। পর্দার আড়ালে এ হেন শিকারী 'পুরুষসিংহ'দের পিঠ চাপড়ে দেওয়া হবে।

ভারতরাষ্ট্রকে যদি একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সংঘ-রাষ্ট্র হয়ে উঠতে হয়, রাজ্যসভাকে তাহলে লোকসভার থেকে মূলগতভাবে আলাদা ধাঁচে গঠন করতে হবে। সমগ্রতার 'মিথ'(কল্পস্বর্গ) থেকে যদি আমরা একটু সরে আসি, তাহলে দেখবো যে, পাকিস্তান ও ভারতরাষ্ট্রের নানা এলাকার ভিন্ন ভিন্ন অতীত রয়েছে, অনেকক্ষেত্রে এমন সব অতীত যা এখনকার

রাষ্ট্রীয় 'কেন্দ্র' থেকে আলাদা ও সম্পর্কহীন (তা সেই কেন্দ্র ইসলামাবাদ, করাচি, দিল্লী বা কলকাতা যা-ই হোক)। ফলত বিভিন্ন এলাকার চিন্তা, ভবিষ্যৎ কল্পনা ও ঈপ্সাও ভিন্নতর, এবং তা বহু ক্ষেত্রেই 'কেন্দ্র'মুখী নয়। মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত কোনো রাষ্ট্র নিজেকে গণতান্ত্রিক সংঘ-রাষ্ট্র তখনই বলতে পারে, যখন বিভিন্ন এলাকার/রাজ্যের বিভিন্নতর ঈপ্সার কারণে তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ হয় না, এবং বিভিন্ন এলাকার ভিন্নতর ভবিষ্যৎ গতিপথকে রুদ্ধ করারও চেষ্টা হয় না। বরং সকল ঈপ্সাকে ধারণ করার মতো নমনীয়তা থাকতে হয় গণতান্ত্রিক সংঘ-রাষ্ট্রে। বিকারগ্রস্তের মতো 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'র মন্ত্র সারাক্ষণ না জপে এমন এক সৃজনশীল ঐক্য সাধন সম্ভব কিনা তার দিকে মনোনিবেশ প্রয়োজন। এই ঐক্যসাধনের প্রথম ধাপ হলো সত্যভাষণ ও স্বীকৃতি। কীসের স্বীকৃতি? স্বীকৃতি বৈচিত্র্যের, যে ভারত বা পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্রই আসলে বহুরাষ্ট্রীক মহা-সংঘ।

ইরম শর্মিলার সংগ্রাম সফল না হওয়ার অন্যতম কারণ এই যে মণিপুরের মানুষের প্রাণ ও সম্মান রক্ষার এই লড়াই ঘটে এমন এক উপমহাদেশীয় রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে অত্যাচারিতের গলা উদাসীন অথবা নির্বিকারের ভীড়ে হারিয়ে যায়, দিল্লী ও ইসলামাবাদের ক্ষমতা কেন্দ্রের অন্দরমহলে ও বাইরে। তাই অনেক ক্ষেত্রে হিংসাত্মক সংগ্রাম হয়ে ওঠে 'সত্যমেব জয়তে' বা 'আল্লাহু আকবর' বা 'নেহরুর স্বপ্নের ভারত' বা 'জিন্নার কল্পিত পাকিস্তান' বা 'রামরাজ্য' বা 'ইসলামের কেল্লা' গোছের দেশজুড়ে প্রচারিত সস্তা শ্লোগানের আওয়াজের মাঝেও নিজের উপস্থিতিকে জানান দেওয়ার একটি উপায়। কল্পিত রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে গড়া জাতীয় সিলেবাস বা অস্ত্রধারী সরকারি কর্মীদের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়ে আর যাই হোক, ঐক্য হয় না— বরং ঐক্যের সম্ভাবনা এবং বৈচিত্র্যময় নানান আত্মমর্যাদার মধ্যে বিভেদ বেড়ে যায়। এককের মর্যাদাকে দলিত করে কোনো মৈত্রীমূলক সামগ্রিক ঐক্য সম্ভব না। ভারত রাষ্ট্রে হিন্দী সংখ্যাগুরু আধিপত্যবাদ বা পাকিস্তার রাষ্ট্রে পাঞ্জাবী-উর্দু সংখ্যাগুরু আধিপত্যবাদের প্রচারকদের নিজেদের কাছে এগুলি আধিপত্যবাদের মতো না ঠেকলেও ভাষাগত বা নৃগোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু মানুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে এ সব অন্যরকম দেখায়। উপমহাদেশে এই সকল প্রশ্ন যখন তোলা হয়, তখন আমরা সহমত বা ভিন্নমত, দুই-ই দেখতে পাই। সংখ্যাগুরুবাদের আদলে যে আধিপত্যবাদ, সেটাকে যারা কোনো ভাবে সমর্থন করতে চান, তাদের পরিচিতি নিয়ে আন্দাজ করার একটা চেষ্টা করে দেখি। যারা এমন আধিপত্যবাদের সমর্থক, এমন একীভূত রাষ্ট্রে নানা আত্মপরিচিতি বিলীন হওয়াকে প্রগতি মনে করেন, তারা কারা? নিজেদের দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে দেখি। এরা কি দিল্লী/ইসলামাবাদ/লাহোর বা গোদা-ভাবে ভারত (অর্থাৎ হিন্দুস্থান) বা পশ্চিম পঞ্জাবের মানুষ? আরেকটা প্রশ্ন মনে মনে করি। যে বা যারা এমন রাষ্ট্রীক ধারণা রাখে, সে কি তার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তার ঠাকুরদার রাজ্যের বাইরে কাটিয়েছে? যদি এই দুই প্রশ্নের একটির উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলেও গড়পড়তাভাবে এই প্রবন্ধে উত্থাপন করা প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে তাদের ধারণা এক ধরনের হবে। সংখ্যাগুরুবাদ এমন এক জিনিস যে অত্যন্ত সৎ গণতান্ত্রিক হাবভাবের মাধ্যমে ঐক্যের নামে খবরদারি কেন্দ্র করে তোলা সহজ। এই উপমহাদেশের গণতান্ত্রিক সংঘ হোক বাস্তবতার ভিত্তিতে, দিল্লী বা ইসলামাবাদের ক্ষমতা কেন্দ্রে বসে থাকা ও তাদের চারদিকে ভনভন করা প্রজাপতিদের ইপ্সার ভিত্তিতে নয়।

আইনের হর্তাকর্তাদের কাছে এহেন মার্কিনি তুলনা আনলে আপনি শুনবেন যে ভারত রাষ্ট্র বা পাকিস্তান, এর একটিও ঠিক সেই অর্থে রাজ্য-সংঘ নয়, যে অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি রাজ্য-সংঘ। এর মাধ্যমে যারা যা বলতে চায় তা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন আনুষ্ঠানিকভাবে নানা রাজ্যের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল, ভারত রাষ্ট্র বা পাকিস্তান এইভাবে রাজ্যগুলি মধ্যে কোনো চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়নি। বরং, ভারত রাষ্ট্রে ১৯৫০-এ গৃহীত সংবিধানের দোহাই দিয়ে তারা বলেন যে রাজ্যগুলি আসলে আইনসভার ইচ্ছেতে সৃষ্ট বস্তু— এগুলিকে যখন ইচ্ছে, যে ভাবে ইচ্ছে তৈরি করা যায়, বদলানো যায়। অর্থাৎ রাজ্যগুলির অস্তিত্ব পুরোপুরি কেন্দ্রীয় আইন সভার শাসন করার সুবিধা নির্ভর— তার বাইরে এগুলির সেই অর্থে কোনো ঐতিহাসিক বা বাস্তব ভিত্তি নেই। এগুলি স্রেফ আইন দ্বারা গঠিত শাসনতান্ত্রিক বিভাগ। সংবিধানের এই ধারণার মাধ্যমে যা করা যায় তা হলো, কেন্দ্রে কক্ষগুলির সাথে মিল খায় এমন সকল রাজ্যভিত্তিক ধারণাকেই একদম গোড়াতেই একটা অবৈধতার চাদরে ঢেকে দেওয়া। কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন, কেন্দ্রের খামখেয়ালে তৈরি যে রাজ্য, এবং সংবিধান স্বীকৃত কেন্দ্রীয় খামখেয়ালে যে রাজ্যের সংজ্ঞা বদলানো যায়, তেমন রাজ্যের আবার স্বাধিকার এল কোত্থেকে? এই আইনি পরিভাষার মধ্যে যে গলদ আছে তা বাস্তবতা দিয়ে যাচাই করা যায়। আজকে উপমহাদেশে যে রাজ্যগুলি আছে (ভারতবর্ষে, পাকিস্তানে), সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোটামুটিভাবে জাতি ও ভাষা-ভিত্তিক। জাতি ও ভাষা কিন্তু কোনো সংবিধানের খামখেয়ালে সৃষ্ট জিনিস না। অর্থাৎ প্রাক-সংবিধান বাস্তবতার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে রাষ্ট্র, কিন্তু সংবিধানের ব্যবহারে এই বাস্তবতাকে যতটা লঘু করে অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্য নামক সত্তাগুলি জাতি-ভাষা ভিত্তিক হওয়ার কারণ হলো, সংবিধান- স্বীকৃত রাজ্য তৈরির অবাধ ক্ষমতা সত্ত্বেও প্রশাসনিক সুবিধার ধুয়ো দিয়ে একটা স্তরের পরে বাস্তবতাকেও উপেক্ষা করা যায় না। আজও

অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিম পঞ্জাব থেকে সেরাইকিস্তান তৈরির চেষ্টা প্রায় সফল হতে চলেছে কোনো প্রশাসনিক সুবিধার কারণে নয় (তাহলে প্রথমে উত্তরপ্রদেশ ভাগ করা হতো)। জাতি-ভাষা কেন্দ্রিক এই দাবিগুলির গণসমর্থনের একটা বাস্তব ভিত্তি আছে।

রাজধানীতে এনে 'কেবল ভারতীয়' বা 'কেবল পাকিস্তানি' বানানোর জন্তর মন্তর ঘর যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যক এখনো তৈরি করা সম্ভব হয়নি, এই দাবিগুলিতে বোঝা যায় যে আত্মপরিচিতির গণ-আত্মহত্যা করার যজ্ঞে সকলে যোগ দিতে রাজি নয়। এই মুহূর্তে রাজ্যগুলির সীমানার দাগগুলিও যে কোনো চিরকালীন মহাসত্য এমন নয়, কিন্তু গোদা ভাবে অনেক ক্ষেত্রেই এগুলির সাথে জাতি-ভাষা ভিত্তিক 'স্বদেশ'-কল্পনার একটা অন্তর্গত সম্পর্ক আছে। এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রীয় সীমানার দাগগুলিও ঠিক এই অর্থে চিরকালীন নয়— বরং বহুজাতিক রাষ্ট্রের সীমানার বাস্তব ভিত্তি বলে যদি কিছু থেকে থাকে তা আরোই নড়বড়ে। যে আইনি শৃঙ্খল এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, তা আসলে অস্বীকার করে যে সংবিধান প্রণয়নের আগেও এই উপমহাদেশ বর্তমান ছিল। যদি এই উপমহাদেশ ফিরিঙ্গি উপনিবেশ না হয়ে উঠত, ভিক্টোরীয় সাম্রাজ্যের অংশ না হতো, এবং এই উপমহাদেশের বুকে যদি এক রাষ্ট্র তৈরি হতে হতো, তাহলে এটা আন্দাজ করা কঠিন না যে সেই বহুজাতিক রাষ্ট্রের ভিত্তি হতো স্বশাসিত নানা রাজনৈতিক এলাকা বা সত্তার মধ্যে এক সমঝোতা বা চুক্তি, অনেকটা মার্কিন ধাঁচে। ১৯৪৭-এ রাজ্যগুলি এমন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সংঘ তৈরির সুযোগ না পাওয়ার একটা বড়ো কারণ হলো ফিরিঙ্গি শাসন। হাস্যকর ভাবে, পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের সংঘ গঠনের কেন্দ্রীকতার ভিত্তি হলো ফিরিঙ্গি শাসন। এই দুই রাষ্ট্রই নিজেদের মৈত্রীতান্ত্রিক বা ফেডারেল বলে চালাতে চায়, কারণ আর কেউই তাদের মৈত্রীতান্ত্রিক মনে করে না।

বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মধ্যে বিরোধ এড়ানোর কিছু সূত্র সারকারিয়া কমিশন দিয়েছিল। আজ সারকারিয়া কমিশনের দেওয়া উপদেশাবলী আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। রাজ্যের স্বাধিকারের দাবি আসলে মানুষের বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধার দাবি। এ দাবির বিরোধিতা আসলে রাষ্ট্রীয় সংখ্যাগুরুবাদ। তফাতটা এই যে এই সংখ্যাগুরুবাদের কেন্দ্রে রয়েছে এক কল্পিত ব্যক্তি নাগরিক। সে যতই মুখে বাংলা বলুক, ধুতি-লুঙ্গি পরুক, অলিম্পিকে তার মাথায় পাগড়িই পড়ানো হবে। কল্প-নাগরিকের সংখ্যাগুরুবাদের মোক্ষম ধ্বংসক্ষমতা এখানেই। কারণ শুধু বাঙালি যে বাঙালি থাকে না তাই নয়। তথাকথিত হিন্দী বলয়ের মৈথিলী মানুষকেও ক্রমে পাগড়ি বাঁধতে শেখায়। মৈথিলীরা হয়ে যায় হিন্দী-হিন্দু-হিন্দুস্থান প্রকল্পের এক সৈনিক। প্রথমে অজ্ঞাতে, মাঝে অনিচ্ছায়, শেষে মহোৎসাহে।

আবার দোহা— কী পেলাম?

৫ পৃষ্ঠার পর

বর্গীকরণ মতে চীন-এর সেই দায় নেই যা মার্কিন দেশের রয়েছে। সারা বিশ্বের সমস্ত দেশ ১৮৫০ সাল থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণে কার্বন নির্গমন ঘটিয়েছে, একা মার্কিন দেশ সেই সময়সীমায় সেই পরিমাণের তিনগুণ বেশি নির্গমন ঘটিয়েছে। মার্কিন দেশের একজন গড়পড়তা নাগরিক যে পরিমাণে কার্বন নির্গমন ঘটিয়ে থাকে, চীনের জনপ্রতি কার্বন নির্গমনের হার তার চেয়ে বহুগুণ কম।

এই সব দিকে নজর না দিয়ে কিয়োটো-বিধি ২০১৫ পর্যন্ত প্রসারিত করা আসলে মার্কিন দেশ সহ পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যবসার সুবিধে করে দিলো। দোহার বর্তমান দফার আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপ্রধানরা অনুপস্থিত থাকলেও সারা বিশ্বের কার্বন লবি, যেমন পেট্রোকেমিক্যাল ব্যবসায়ীদের সংস্থা শক্তি পরামর্শদাতা সংস্থা এবং কার্বন ব্যবসায় লিপ্ত ব্যাঙ্ক-এর প্রতিনিধিরা মঞ্চ একেবারে আলো করে বসেছিলেন। মনে রাখা দরকার, কিয়োটো বিধি চালু না থাকলে কার্বন ব্যবসা করা বেআইনি, তাই ২০১৫ পর্যন্ত কিয়োটো বিধি প্রসারিত হওয়ায় এমন এক অন্যায্য মুনাফা করার জন্য আইনি ছাপ পড়লো। কিয়োটো বিধি তার বর্তমান অবস্থায় চালু থাকলে তা কার্বন নির্গমন কমানোর পরিবর্তে কার্বন নির্গমন বাড়াবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে থাকা ইংল্যান্ড-এর রাজধানী লন্ডন-এর মাধ্যমে বিশ্বের ৮০ শতাংশ কার্বন ব্যবসা চলে, যার একটা বড় অংশ বকলমে চালায় মার্কিন দেশ, যারা কিয়োটো-বিধি মানে না। ২০১৫ সালের মধ্যে সারা বিশ্বের কার্বন ব্যবসার বাজারটি স্ফীত হয়ে ৯০ বিলিয়ন পাউন্ড-স্টারলিং হয়ে উঠবে।

বর্তমান দোহা দফার আলোচনার যা হাল তা থেকে দু তিনটে বিষয় স্পষ্ট। (১) যতদিন মুনাফা-ভিত্তিক করপোরেশনগুলো পরস্পরের সঙ্গে অর্থনৈতিক বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকবে, ততদিন তারা বিশ্বের পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিহত করার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধা দেবে; (২) এমন কি বর্তমানে যে প্রযুক্তি রয়েছে, যা দিয়ে শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির পুনর্গঠন সম্ভব, মুনাফার চাপে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ সেই সামান্যতম ক্ষতি স্বীকার করতেও অপারগ; (৩) শ্রম যদি পুঁজির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, তাহলে মুনাফা-কেন্দ্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে শ্রম-কেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন বিপ্লব, সংস্কার নয়। স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ থেকে শোলাপুর কমিউন, পেট্রোগ্রাদ থেকে পতেঙ্গার জনশিবির এককালে সেই ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছিলো, বলশেভিক বিপ্লবের আসন্ন শতবর্ষে পৃথিবী কোন পথে হাঁটবে, তা ভবিষ্যতের নাগরিকদেরই নির্ধারণ করতে হবে। এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে...

সমরেশ মিত্র

প্রবন্ধ

সব ধরনের বদমায়েশি?

আর্থিক অভিজাততন্ত্র ও ভারত সরকার

বার্নি*

কণ্ঠ আমার অপরাধ
ভাবনা নৈরাজ্যবাদী
কারণ
ওদের সুরে গাই না আমি গান
আমার কাঁধে চাপিয়ে নিই না ওদের

—চেরাবান্দারাজু

দু দশক এক বছর হলো ভারতের এলিটরা নয়া উদারনীতিকে জাপটে ধরেছে। টাকা— সবকিছুর মানদণ্ড, মানুষের মূল্যের হিসাব হয় যে টাকা দিয়ে, সেই টাকাকে লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করার পথ এখন ১৯৯০-এর দশকের প্রথমাংশের চেয়ে অনেক বেশি। সত্যি বলতে কী, ভারতের ধনীদের এখন সব রকম পথে সম্পদ আহরণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। ''দুর্নীতি'' আকাশ ছুঁয়েছে। আর সিভিল সোসাইটি, যার চালকের আসনে রয়েছে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী, তারা এতে স্তম্ভিত। ''অনৈতিক'' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে তারা এককাট্টা, কিন্তু পুঁজির সবচেয়ে ক্ষমতাশালী অংশ, ''আর্থিক অভিজাততন্ত্র'', আসল ক্ষমতা যাদের হাতে, তাদের বিরোধিতা করেন না এরা। ''এদেশ থেকে উৎসারিত কালো টাকার পরিমাণ'' ও দেশের বাইরে করছাড়ের স্বর্গরাজ্যগুলিতে ও আর্থিক কেন্দ্রগুলিতে ''জমিয়ে রাখা হিসাব-বহির্ভূত সম্পদের'' নানান আনুমানিক হিসাব আছে। এই সব বিষয় নিয়ে সংসদে হইচই কমছে না, সরকার তাই কালো টাকার ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে।

এই শ্বেতপত্রের ভূমিকায় (তৎকালীন) কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী (তাকে এখন ঠেলে ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি এখন রাষ্ট্রপতি ভবন নামক প্রাসাদটির অধিবাসী) লিখেছেন, ''আমাদের সমাজের নৈতিক চরিত্র শক্তিশালী করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে অনেক কিছু করতে পারি আমরা''। মূল পর্যন্ত পচে যাওয়া এক ব্যবস্থার নেতৃস্থানীয় এক রাজনৈতিক প্রতিনিধির কাছ থেকে এরকম বাণীকে কেউই বিশেষ পাত্তা দেবে না নিশ্চয়। বিদেশে পাঠানো কালো টাকার কথা স্বেচ্ছায় প্রকাশ করলে তাকে 'সাদা' টাকা হিসেবে ফেরত আনার যে প্রকল্পটি এই শ্বেতপত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পেয়েছে, যেটিকে সরকারের ইচ্ছা বলে ধরে নেওয়া যায়, সেই প্রস্তাবটিকে কীভাবে দেখা উচিত? অর্থমন্ত্রীর যদি কোনো 'নৈতিক চরিত্র' থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয় সুদসহ থোক একটা আয়কর ও জরিমানা দিতে হবে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয় জানেন যে এই টাকা আইনসিদ্ধ কাজ থেকে এসেছে কিন্তু কর দেওয়া হয়নি তা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই এই টাকা সম্পদ আত্মসাৎ, ইনসাইডার ট্রেডিং, কমিশন ও ঘুষের টাকা। অনেক ক্ষেত্রে আবার ড্রাগ চোরাচালানের মতো বেআইনি কাজকর্মের টাকা। শ্রী মুখার্জী নিশ্চয় জানেন যে এইধরনের একটি প্রকল্প যে শুধু সঠিকতা ও ন্যায়বিচারের নীতির বিরোধী তাই নয়, তা আমাদের সমাজের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করতে পারে, যা উনি, বলাই বাহুল্য, জোরদার করতে চান। সরকারের যদি কোনো নৈতিক চরিত্র থাকত তবে কালো টাকার অধিকারীদের বেআইনি সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য সাধারণ মানুষের কথা শুনত। সত্যি বলতে কী, সাধারণ মানুষ আশা করেন যে, নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন কোনো সরকার শুধু সুইস ব্যাংক নয়, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা কালো টাকার অধিকারী ভারতবাসীদের টাকা বাজেয়াপ্ত করবে।

এখন, আমরা যদি শ্বেতপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্যটা ঠিকমতো বুঝে থাকি তাহলে শ্বেতপত্র প্রকাশ হওয়া উচিত সমস্যাটি সমাধানের উদ্দেশ্যে। এটি কালো টাকার বিষয়ে সরকার কী ব্যবস্থা নিতে চান তা প্রকাশ করবে। আর অন্তত, পাঠকদের কালো টাকা সম্পর্কে শিক্ষিত করবে। কিন্তু এই শ্বেতপত্রে ধারণাগত স্বচ্ছতা নেই। অর্থমন্ত্রক তাহলে ভারতের কালো অর্থনীতির আকার সম্পর্কে ধারণা তৈরির সূত্রপাতই বা করবে কী করে?

কালো অর্থনীতি বাড়ছে

দ্য ব্ল্যাক ইকনমি অফ ইন্ডিয়া (পেঙ্গুইন বুক্‌স, নিউ দিল্লী, ১৯৯৯) গ্রন্থে অরুণ কুমার হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে ১৯৯৫-৯৬ সালে ভারতের কালো অর্থনীতি ছিল ভারতের সরকারি (''সাদা'') মোট জাতীয় আয়ের (জিডিপি) মোটামুটি ৪০ শতাংশ। এর আগে, কেম্ব্রিজের একজন প্রধান অর্থনীতিবিদ নিকোলাস ক্যালডর হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের কালো অর্থনীতি ছিল সাদা মোট জাতীয় আয়ের ২-৩ শতাংশ, আর ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস এনকোয়ারি কমিটি-র (ওয়াংচু কমিশন) হিসাব অনুসারে ১৯৬০-এর দশকে

* বার্নির এই প্রবন্ধটির প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল মান্থলি রিভিউ পত্রিকা পরিচালিত MRZine ওয়েবসাইটে। লেখাটিকে লেখক এরপর আপডেট করে পাঠিয়েছেন 'অনীক'-এ প্রকাশের জন্য।

শেষাশেষি কালো অর্থনীতি ছিল সাদা জিডিপি-র ৭ শতাংশ।

১৯৫৫-৫৬ সালের কালডরের হিসাবমতো সরকারি জিডিপি-র ২-৩ শতাংশ থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে সাদা জিডিপি-র ৪০ শতাংশ— কালো অর্থনীতির আপেক্ষিক আকার ১৬ গুণ বেড়েছে। আমাদের ধারণা অনুসারে, এর কারণ বড়ো বুর্জোয়ার একটা অংশের প্রভাব বৃদ্ধি— দেশের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য এরা ধীরে ধীরে নিজেদের সংগঠিত করেছে। জোর দিয়ে বলা দরকার যে, কুমারের হিসাব অনুসারে ১৯৯৫-৯৬ সালে ভারতের মোট জাতীয় কালো আয়ের পাঁচ ভাগের চার ভাগ এসেছিল আইনি অর্থনৈতিক কাজকর্ম থেকে, আর এই আয়ের বেশির ভাগটাই কোনো কাজকর্ম থেকে আয় নয়, সম্পত্তি থেকে আয়। মনে রাখতে হবে যে এর মধ্যে সম্পত্তি বিক্রিজনিত আয় (ক্যাপিটাল গেইন্‌স) ধরা হয় নি। এর থেকে মনে হয়, ভারতের মোট জাতীয় আয়ে কালো অর্থনীতির অংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়ের শ্রেণীগত বণ্টন বেশি বেশি করে পুঁজির দিকে ঢলে পড়ে।

কালো টাকা কীভাবে তৈরি হয় তার একটা উপায় উদাহরণস্বরূপ বলা যাক। শ্বেতপত্রের ১.৩.১১ ধারায় ''উৎপাদন কম দেখানো'' শিরোনামে এর উল্লেখ আছে। এখানে আমরা আবার অরুণ কুমারের বইয়ের শরণ নেব। একটা উদাহরণ হলো, কোনো কিছুর (ধরা যাক, মদের) উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন কম দেখিয়ে পরোক্ষ কর ফাঁকি দেওয়া। যেহেতু ঘোষিত মোট উৎপাদনে সমস্ত উৎপাদন ব্যয় ও অন্যান্য খরচ ধরে নেওয়া হয়, অঘোষিত উৎপাদন বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় সেটা ঘোষিত আয়ের বাইরে বাড়তি মুনাফা। এর ওপর কোনো আয়কর দেওয়া হয় না, শেয়ারহোল্ডারদের কোনো লভ্যাংশ দেওয়া হয় না। লক্ষ্য করতে হবে যে, এই অঘোষিত উৎপাদন কিন্তু ঘোষিত উৎপাদনের সমান দামেই বিক্রি হয়। এর ওপর যে এক্সাইজ কর, বিক্রয় কর ও অক্টরয় সরকারকে দিতে হতো, সেই টাকার পুরোটাই এখন মুনাফা হিসেবে পকেটে চলে আসে। এই অঘোষিত উৎপাদন অনেক দিন ধরেই, আজও, ''শিল্পপতি'', রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি অফিসারদের সবচেয়ে বেশি মুনাফার একটা জায়গা। কিন্তু তবে সাংবাদিকরা এর কথা লেখে না। তার বদলে মদ ও এয়ারলাইন-বিলিওনেয়ারের প্রমোদতরণীতে পার্টি, ফর্মুলা ওয়ান রেসিং ও আইপিএল ক্রিকেটে একটি দলের মালিক হিসাবে তার ছবি কাগজে ভালো চলে।

কুমারের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রের (পলিটির) তিনটি ক্ষমতাশালী অংশ— আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থার মধ্যে, এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে, দুর্নীতি বাড়ছে, আর তার ফলেই কালো অর্থনীতি বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া, মোট জাতীয় আয়ে কালো টাকার বৃদ্ধির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রের আপেক্ষিক বৃদ্ধি (জনপ্রতি জাতীয় আয়ে যার অংশ খুবই বেশি) ও মোট জাতীয় আয়ে সম্পত্তি থেকে আসা আয়ের অংশ বৃদ্ধির। ওপরে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তাতে অন্য দুটি প্রতিষ্ঠান, পলিটি ও আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও আইনব্যবস্থার, সহযোগিতা ছাড়া, তাদের টাকা না দিয়ে, মদ শিল্পে কালো টাকা তৈরি সম্ভব হতো না।

বাজার ও অর্থনীতিকে যা চালায়

দেশের বাইরে যে কালো টাকা জমানো রয়েছে, যে টাকা এখন সাদা দেখানোর জন্য ফিরিয়ে আনার কথা চলছে, তার ইতিহাস কী? হিন্দু জাতীয়তাবাদী লালকৃষ্ণ আদবানি বা নরেন্দ্র মোদি অথবা ভারতীয় নৈতিকতার বাহক বাবা রামদেবের মাঝে মধ্যে হুংকার বাদ দিলে, যারা ''টাকার পূর্ণ পরিবর্তনশীলতার কথা বলে'' তাদের কাছে ''দেশের বাইরে জমিয়ে রাখা কালো টাকা ফিরিয়ে আনার'' ব্যাপারটা পছন্দের হবে না। শ্বেতপত্রে সরকার গর্বের সঙ্গে বলেছে যে তাদের আমলে, ২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে, সুইস ব্যাংকে ভারতীয়দের (ধরে নেওয়া যেতে পারে, ভারতের অধিবাসীদের) মোট টাকার পরিমাণ ২৩,৩৭৩ কোটি টাকা থেকে কমে হয়েছে ৯২৯৫ কোটি টাকা। কিন্তু রাজস্ব বিভাগের ও প্রত্যক্ষ করের কেন্দ্রীয় বোর্ডের অফিসাররা নিশ্চয় জানেন যে ধনী ব্যক্তি ও কোম্পানিরা পোর্টফোলিও ম্যানেজার রাখে, যারা তাদের টাকা বিদেশে রাখার ব্যবস্থা করে, এই টাকা আর্থিক ও অ-আর্থিক সম্পদের একটি পোর্টফোলিও হিসাবে বিনিয়োগ করা হয়, যার মধ্যে ব্যাংকে টাকা রাখা অনেক উপায়ের একটি মাত্র। আজকের আর্থিক বিশ্বে সুইস ব্যাংকে রাখা টাকা খুব কম সময়ের মধ্যেই অন্যান্য করছাড়ের স্বর্গে বা দেশের বাইরের কোনো আর্থিক কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া যায়, এমন কি ভারতেও নিয়ে আসা যায় আর এক দফা ব্যবসার জন্য।

শ্বেতপত্রে এ ধরনের পুঁজি ফেরার কথা বলা হয়েছে। ''সুবিধাজনক কর নীতি, বিশ্বজোড়া ডিপোজিটরি রিসিপ্টের মাধ্যমে ভারতীয় কোম্পানিদের পুঁজি আনা, এবং পার্টিসিপেটরি নোটের মাধ্যমে ভারতীয় স্টক মার্কেটে বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ'' (সেকশন ২.৪.৯)। এর মধ্যে শেষেরটি, অর্থাৎ পার্টিসিপেটরি নোট হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকারী ভারতীয় সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে পারবে, কিন্তু ভারতের নিয়ন্ত্রণকারীরা জানতে পারবে না কে বিনিয়োগ করছে। কালো টাকাকে সাদা করার একটা সহজ পথ। এটা এখনও করতে দেওয়া হচ্ছে। শ্বেতপত্রে বলাও হয়নি যে এটা বন্ধ করা উচিত। বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী যে মরিশাস বা সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে ঘুরিয়ে বিনিয়োগ করে, তার বিরুদ্ধেও শ্বেতপত্রে কিছু বলা হয়নি, যদিও এটা করা হয় কর দেওয়া থেকে বাঁচতে ও আসল বিনিয়োগকারীর নাম নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃত্বের কাছ থেকে গোপন

রাখতে— যদিও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তারা ভালোই জানেন যে এদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা এই পথে (ঘুরপথে) তাদের নিজেদের কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে (রাউন্ড ট্রিপিং)।

১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে স্টক মার্কেট খুবই উদ্বায়ী (volatile) রয়েছে। এই স্টক মার্কেটে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কম, কম শেয়ার কেনাবেচা হয়। ২০০৩-০৪ থেকে ২০০৭-০৮-এর মধ্যে নিট পুঁজি আগমন (বেশি মুনাফার সন্ধানে) হয়েছে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ঘাটতির চেয়ে অনেক বেশি। এতে মার্কেট আগের তুলনায় অনেক উপরে চড়ে গেছে, তাতে একটা "ওয়েল্‌থ এফেক্ট" (সম্পদের মূল্যবৃদ্ধি) দেখা গেছে, লিকুইডিটি বেড়েছে, এবং তার ফলে ভোক্তার নেওয়া ঋণ বেড়েছে (এলিটরা নিজেদের ভোগ বাড়িয়েছে), বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে "এনিম্যাল স্পিরিট" (জান্তব কাড়াকাড়ি) বেড়ে গেছে। এসবের ফলে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। কিন্তু ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে সংকট দেখা দেওয়ার পর নিট পুঁজি আগমন হঠাৎ করেই নিট পুঁজি বহির্গমনে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে, সংকট কমার লক্ষণ দেখা দিতেই উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বে সহজ মানিটারি নীতি নেয় এবং ভারতের মতো উদীয়মান বাজারগুলি আবারও "পছন্দের" হয়ে ওঠে। আবারও দেখা দেয় "ওয়েল্‌থ এফেক্ট", তারল্য, ভোক্তাদের নেওয়া ঋণ বৃদ্ধি, লা গ্রান্দে বুফে (এলিটদের ভোগ বৃদ্ধি), "অ্যানিমাল স্পিরিট্‌স", ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে আবার দেখা দেয় উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি। কিন্তু ইউরো অঞ্চলে সংকট দেখা দিতেই আবার পুঁজি আগমন কমে যায়। এই ধরনটা বুঝতে পেরে ভারত সরকার আর্থিক বাজারকে খুশি রাখার জন্য যতটা সম্ভব চেষ্টা করে, কারণ এই আর্থিক বাজারেরই ক্ষমতা আছে পুঁজির উদ্বায়ী আগমন বা বহির্গমন দিয়ে বাজারকে কখনো তেজি কখনো পুরো বিধ্বস্ত করার।

বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর পর থেকে সরকার বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যতটা সম্ভব সবই করছে। তারা এ দেশকে করছাড়ের স্বর্গ বানাচ্ছে, অন্তত তালিকাভুক্ত ইকুইটি পুঁজির ক্ষেত্রে (ইকুইটি পুঁজি বলতে বোঝায় বিনিয়োজিত যে অর্থ, ঋণ-পুঁজির মতো, নিয়োগকারীদের ফেরত দেওয়া হয় না। এর হিসেব করা হয় কোম্পানি মালিকানাধীন সব কিছুর বর্তমান বাজার দাম থেকে সমস্ত দায় বিয়োগ করে)। বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ভারতীয় বাজারে আগমনের ২০ বছর পূর্ণ হবে আগামী বছর। কার্যরত পোর্টফোলিও ম্যানেজার হিসাবে তারা বাজারকে গতি দেয়, কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত সিকিউরিটিস অ্যাক্ট এক্সচেঞ্জ বোর্ডের (SEBI বা *সেবি*) একটাও গবেষণাপত্র পেলাম না যেখানে জনসাধারণকে বিভিন্ন ধরনের বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ, সেগুলির কোন্‌টা কতটা কাজ করছে, তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় পোর্টফোলিও কীরকম, তাদের পুঁজির আগমন ও নির্গমন কেমন, পার্টিসিপেটরি নোটের ব্যবহার কীরকম, বেসরকারি ইকিউটি ফার্মের সঙ্গে, ভারতীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও প্রোমোটার-ডিলার নেটওয়ার্কের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেমন, এসব বলা হয়েছে। বিশ্বায়িত লগ্নিপুঁজির জমানায়, প্রধান কেন্দ্রগুলিতে বিনিয়োগের পোর্টফোলিও যুক্ত থাকে, বাজার (এর মধ্যে স্টক, বন্ড, টাকা, রিয়েল এস্টেট, সরকারি বন্ড, বিদেশি মুদ্রা ও পণ্য, সবই পড়ে) চলে দিনরাত। সোমবার সকালে সিডনি-টোকিও হয়ে মাঝে লন্ডন, ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘুরে শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় চলে যায় নিউইয়র্ক চিকাগোতে (ডিজিটাল বই ঠিক সময়মতো ঠিক জায়গায় পৌঁছে যায়)। এর খোঁজ রাখাকে বলে "রাউন্ড ট্রিপিং", পায়ের ছাপ খুঁজে বের করা। কাজটা খুবই কঠিন।

ক্যাকাসের মতো পিছনের দিকে হাঁটার পদচিহ্ন

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে আর্থিক অভিজাতরা ও শিল্প বুর্জোয়ারা কীভাবে তাদের সম্পদ পেয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়, দেখানো হয় যে ব্যবস্থা প্রায় কখনোই তাদের পক্ষে কাজ করেনি। এটা চলে আজও, যখন ভারতের দুর্নীতি নিয়ে গুগুল-এ খোঁজ লাগালে ৬.৬৭ কোটি উত্তর পাওয়া যায়! বাণিজ্য সম্পর্কিত সংবাদমাধ্যম অনুসারে ভারতের বিলিওনেয়াররা সবাই দারুন "উদ্যোগপতি", "আবিষ্কর্তা"। এসব দেখে রোমান পৌরাণিক চরিত্র ক্যাকাস নিয়ে মার্কসের বক্তব্য প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বের্টেল ওলম্যানের কথা মনে পড়ে যায়।

> ক্যাকাস ছিলেন রোমের এক পৌরাণিক চরিত্র। তিনি গরু চুরি করতেন গরুগুলোকে তার নিজের বাড়ি পর্যন্ত পেছন দিকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে, যাতে পায়ের ছাপ দেখে মনে হয় গরুগুলো যেন তার বাড়ি থেকেই বেড়িয়েছে। লুথার কৃত এই গল্পের উল্লেখ করে মার্কস বলেছিলেন, "দারুন এক ছবি, পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সাধারণভাবে ঠিকঠাক মিলে যায়— পুঁজিবাদীরা ভান করে যে তারা যা অন্যদের কাছ থেকে নিয়েছে, নিজেদের ঘরে নিয়ে গেছে, সেগুলো যেন আসলে তাদের কাছ থেকেই এসেছে, এরকম পেছনের দিকে হাঁটিয়ে তারা দেখায় যেন ওগুলো তাদের ঘর থেকেই এসেছে।"

পুঁজিপতিরা নিজেদের ধনের উৎপাদক, কর্মসংস্থানের হোতা, দাতা ও জনগণের উপকারী বান্ধব বলে দেখায়। সংবাদমাধ্যম (তাদের সংবাদমাধ্যম) তাদের সম্পর্কে বলে যে তারাই "শিল্প"। এটা কি তাদের সঠিক চরিত্রায়ণ?... পায়ের ছাপ সবাই দেখতে পায়, কিন্তু যদি আমরা সেই ছাপ থেকে ওপর ওপর যা মনে হয়... তা থেকেই সিদ্ধান্তে উপনীত হই সেটা হবে সত্যের বিপরীত।

...আগের প্রজন্মের শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত শ্রম থেকে (এবং, এখানে যোগ করা যায়, উচ্চপদে আসীন বন্ধুদের সহায়তায় বিভিন্ন বাণিজ্যিক কার্যকলাপ থেকে) পুঁজিপতিরা কীভাবে তাদের সম্পদ পেয়েছে তা (ইতিহাস) আর আমাদের আইন, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি কীভাবে তাদের পক্ষে ঝুঁকে আছে তা পরীক্ষা করে দেখলে তবেই আমরা দেখতে পাব যে তারা সমাজের সেবা করছে না, সমাজের বাকি অংশই বরং তাদের সেবা করছে।

আদিম সঞ্চয়?

এখন, সরকারি ভাষায়, সরকারি কর্মচারিদের কাজের জন্য বেতনের বাইরে টাকায় বা জিনিসের মাধ্যমে কিছু দেওয়া, অর্থাৎ ''ঘুষ'', সেটাই শুধু দুর্নীতি। আর কালো টাকা হলো সেই ''সম্পদ বা সম্পত্তি যা তৈরির সময় বা হাতে থাকাকালীন কখনো সরকারকে জানানো হয়নি''। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ সালে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী থাকাকালীন এ. রাজা মোবাইলের ২জি স্পেকট্রাম খোলাখুলি নিলাম না করে বেআইনিভাবে 'প্রথমে-যে-আসবে-তাকে' নীতিতে ২০০১ সালের দরে বিক্রি করে ঘুষ যা পেয়েছেন সেটা ''দুর্নীতি'', কিন্তু এই ''ঘুষ'' তো রাষ্ট্র রাজস্ব হিসাবে যে কোটি কোটি টাকা হারালো তার ছোট্ট একটা অংশমাত্র।

কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (CAG) হিসাব অনুসারে বে-তার স্পেকট্রামের অংশ বিক্রিতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হারিয়েছে ১,৭৬,৬৪৫ কোটি টাকা। সেই টাকা লাভ হয়েছে কিছু বেসরকারি সংস্থার, যারা কম দামে লাইসেন্স পেয়েছে। এই লাইসেন্সের অর্থ হলো অত্যন্ত দুর্লভ এক প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা, আর এই মালিকানা যে আদৌ বিক্রি করা হলো তার কারণ আবার নিহিত আছে টেলিকম ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের মধ্যে। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২জি লাইসেন্স দেওয়াকে বলেছেন, ''অসাংবিধানিক ও খেয়ালখুশি মতো'', এবং তা বাতিল করেছেন। কোর্ট ঠিকই বলেছেন যে টেলিকম-মন্ত্রী রাজা ''আসলে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ যেন উপহার হিসাবে বিতরণ করেছেন''। কারণ, এই লাইসেন্স পাওয়ার পরেই লাইসেন্স প্রাপকদের কয়েকজন, ইউনিটেক ওয়ারলেস, সোয়ান টেলিকম ও টাটা টেলিসার্ভিসেস, তাদের ইকুইটির একটা বড় অংশ যথাক্রমে নরওয়ের টেলিনর, ইউএই-র এটিসালাত ও জাপানের এনটিটি ডোকোমো-কে বেচে দিয়ে বিরাট টাকা লাভ করেছে।

প্রভাত পট্টনায়কের মতে, বে-তার স্পেকট্রামের একটি অংশ (জাতীয় সম্পত্তি) নিলাম করার (যা করলে সঠিক দাম পাওয়া যেত) বদলে ''জলের দরে'', ২০০১ সালের দামে ২০০৮ সালে, বেআইনিভাবে যে-আগে-আসবে-তাকেই বেসরকারি মালিকানায় দিয়ে দেওয়াটা আসলে ''মার্কস যাকে বলতেন 'পুঁজির আদিম সঞ্চয়'''। পট্টনায়কের মতে, জাতীয় সম্পদের বেসরকারিকরণ ''আদিম সঞ্চয়ের'' অংশ কিনা সেটা এই হাতবদলের দামের সঠিকতা-বেঠিকতার ওপর নির্ভর করে না। আমাদের মতে, সমস্ত বেসরকারিকরণ ঘটার কারণ হলো এই যে, কোনো কোনো জাতীয় সম্পদ বা পরিষেবা বেসরকারি হাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে মুনাফা পাওয়া যায়। আর এই হস্তান্তরের দাম ''সঠিক'' বা ''ন্যায্য'' হোক আর নাই হোক, সব বেসরকারিকরণই আসলে ''নিঃস্বকরণের মাধ্যমে সঞ্চয়'', যদিও তা সবসময় আদিম সঞ্চয় নাও হতে পারে।

সত্যি বলতে কী, ডেভিড হার্ভের মতো বিখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা আরও কিছু বলছেন। নয়া উদারনৈতিক জমানায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে উচ্চ শ্রেণীগুলির হাতে, বা বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে, সম্পদ ও আয় হস্তান্তরের সমস্ত ব্যবস্থাগুলোই তাঁর মতে ''নিঃস্বকরণের মাধ্যমে সঞ্চয়''। তিনি দাবি করছেন যে এইসব সঞ্চয় পুঁজিবাদের সূচনার যুগে মার্কস যাকে ''আদিম'' বা ''আদি'' বলেছিলেন তারই ধারাবাহিকতা ও বিকাশ।

আমাদের ধারণা অনুসারে, মার্কসের চিন্তায় ''আদিম সঞ্চয়''-এর দুটো প্রধান উপায় ছিল। এক, এনক্লোজারের (ক্ষমতাশালী জমিদাররা রাষ্ট্রে নিজেদের প্রভাব কাজে লাগিয়ে সাধারণের জমি ব্যক্তিগত স্বার্থে কুক্ষিগত করে নেয়) মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা, শেষপর্যন্ত তাদের সামনে কৃষিতে বা শিল্পে মজুরি শ্রমিক হওয়া ছাড়া কোনও রাস্তা না রাখা। আর দুই, দেশ জয় করা, ক্রীতদাস করা, সম্পদ আহরণ ও লুঠের মাধ্যমে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিধি থেকে হরণ করা। *পুঁজি* বইটির প্রথম খণ্ডের অংশ ৮-এ ''শিল্প পুঁজিপতির উদ্ভব'' অধ্যায়ে (অধ্যায় ৩১) মার্কস একথাই বলেছেন:

> আমেরিকায় সোনা ও রূপো আবিষ্কার, সেখানকার মানুষদের বিনাশ, ক্রীতদাসকরণ ও খনিতে কাজে লাগানো, ইস্ট ইন্ডিজ বিজয় ও লুঠ, আফ্রিকাকে বাণিজ্যিকভাবে কালো চামড়া শিকারের জায়গা বানানো— এগুলিই পুঁজিবাদী উৎপাদনের সোনালী সকালের সূচনা। এইসব মনোরম কার্যকলাপই আদিম সঞ্চয়ের প্রধান চালক।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সূচনার সময়ে পুঁজি প্রথমে যেভাবে সঞ্চিত হয়েছিল তার দুটো উপায়ই আসলে জনগণের থেকে 'চুরি'। প্রথম ক্ষেত্রে, নিজের দেশের জনগণের কাছ থেকে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, উপনিবেশিকতার মাধ্যমে, অন্য দেশের জনগণের কাছ থেকে বিরাট মাত্রায় ''চুরি''। দুটো ক্ষেত্রেই ক্ষমতাবানরা যা চেয়েছে তাই নিয়েছে, আর এতে মার্কস হিংসার ওপর জোর দিয়েছেন।

বেসরকারিকরণ, আর্থিকীকরণ ও সংকট নিয়ে কৌশলী

কার্যকলাপের মাধ্যমে পুঁজির স্বপক্ষে পুনর্বণ্টন, সাধারণ মানুষকে উচ্ছেদ করে কৃষি জমিকে রিয়েল এস্টেট বানানো, সাধারণ সম্পত্তিকে ধনীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা, পরিবেশগত আক্রমণ ইত্যাদি উপায়ে "নিঃস্বকরণের মাধ্যমে সঞ্চয়", এ সবই, হার্ভের মতে, "আদিম সঞ্চয়"। আমি অতটা বলব না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেমন ২০০৩ সালে, ইরাকের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তাকে নয়া-উপনিবেশ বানাতে ও তার তেল ভাণ্ডারের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে, তাকে, বা সাধারণভাবে শক্তিশালী মার্কিন কর্পোরেশন ও ব্যাংকগুলির সাম্প্রতিককালে ওয়াশিংটনের সঙ্গে একযোগে দেশের বাইরে আর্থিক সংকটে দুর্বল হয়ে পড়া কর্পোরেশন বা ব্যাংকের দুর্বলতার সুযোগে মুনাফা লোটাকেও আমি আদিম সঞ্চয় বলব না। আদিম সঞ্চয় নিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে হার্ভে এটাও বলেছেন যে ক্রীতদাস-বাণিজ্য এখনও চলছে যৌন ক্রীতদাস প্রথা বা যৌন-দাসী চালান প্রথার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এর সঙ্গে ইউরোপীয় ক্রীতদাস-বাণিজ্যের তুলনা করলে, বা পশ্চিম ইউরোপ কীভাবে আফ্রিকার অনুন্নয়ন ঘটিয়েছিল সেটা দেখলে, বা ওয়াল্টার রডনির *হাও ইউরোপ আন্ডারডেভলপ্‌ড আফ্রিকা* (১৯৭২) পড়লে বোঝা যাবে হার্ভের তুলনাটা নেহাতই কষ্টকল্পনা।

বিশ্বের প্রথম শিল্প-পুঁজিবাদী শক্তি ইংল্যান্ডের উদ্ভব নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে মার্কস শক্তিপ্রয়োগ ও হিংসার ভূমিকার ওপর জোর দেন। তাঁর কথায়, পুঁজি এসেছিল "মাথা থেকে পা পর্যন্ত, শরীরের প্রতিটি রোমকূপে, রক্ত ও নোংরা মেখে" (*পুঁজি*, খণ্ড ১, অধ্যায় ৩১)। কিন্তু একবিংশ শতকের ভারতের ক্ষেত্রে পট্টনায়ক জোর দেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর, যে ব্যবস্থা অন্যায়ভাবে পুঁজি সঞ্চয় করে, যাকে তিনি "আদিম" সঞ্চয় আখ্যা দিয়েছেন। আর, হার্ভের কথায়, বর্তমান নয়া-উদারনীতির যুগে বেসরকারিকরণের মাধ্যমে (অথবা অন্য ভাবে) সরকারি সম্পত্তির মালিকানা হাতে নেওয়ার অর্থই হলো আদিম সঞ্চয় চলতে থাকা।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংল্যান্ড যখন দক্ষিণ এশিয়াকে এলাকাগত ভাবে ও বাণিজ্যিকভাবে তাদের অধীনে নিয়ে এলো, আমাদের ধারণায়, ভারতের ক্ষেত্রে আদিম সঞ্চয় ঘটেছে তখনই। ভারতকে একটি অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে তৈরি করা হলো। ভারত মহাসাগরে ইংল্যা'ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর এই প্রক্রিয়াটি আরও জোরদার হলো। মহারাণীর রাজত্বে ও তার পর এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। চলতে থাকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত, এবং তার পরেও। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে যখন ভারতের বুর্জোয়ারা নির্ভরশীল শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু করে, স্বাধীনতার পর যত দিন না ভারতের পুঁজিবাদ অনুন্নত হলেও নিজেদের পায়ে দাঁড়ায়, ততদিন এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অবশ্য, ভারত, ইংল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের অধীনস্থ অন্যান্য উপনিবেশগুলি পারস্পরিক সম্পর্কে লিপ্ত থেকে গেছে। ভারত ও ইংল্যান্ডের অন্য উপনিবেশগুলি ইংল্যান্ডের উন্নয়নে সাহায্য করেছে, যদিও ইংল্যান্ড তাদের অনুন্নত করে রেখেছে। আর এ সবের মধ্যে ভারতের বর্তমান অবস্থার, বর্তমান ব্যবস্থার (বা অব্যবস্থার) মূল খুঁজে পাওয়া যায়। মূল খুঁজে পাওয়া যায় আজকের "নিঃস্বকরণের মাধ্যমে সঞ্চয়ের"-ও। আজকের এই ঘটনাকে "আদিম" বা "আদি" বলার কোনো কারণ নেই।

ভারতের ক্ষেত্রে আদিম সঞ্চয় ঘটেছে ১৭৫৭-১৮১৩ সময়কালের সম্পদ হরণের মধ্য দিয়ে, তারপর বি-শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে, এবং তার পরে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের মধ্য দিয়ে, পাশাপাশি ঘটেছে ভূমিহীন মজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি। ভারতের বন আইন ১৮৭৮ ও ১৯২৭ এবং ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনের মাধ্যমে রেল, বাগিচা ও খনি, আর পরবর্তী কালে নির্ভরশীল বৃহৎ শিল্পের জন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জমি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যে পুঁজি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ফারাক থেকেই গেছে। যেন সব সময়, সর্ব ক্ষেত্রে, সব কিছুর মধ্যে, সর্বত্র, এই প্রক্রিয়াটির নিজস্ব একটা ধর্ম এটি। কিন্তু পুঁজির প্রথম সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে আদিম সঞ্চয় অনেকদিন আগেই তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

কৃষি জমি থেকে রিয়েল এস্টেট

সে যাই হোক, পুঁজি কর্তৃক জাতীয় সম্পদ লুঠের বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। শ্বেতপত্রে 'দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড' অধ্যায়ে রিয়েল এস্টেট, স্টক মার্কেট, খনি ও জাতীয় সম্পদের ওপর মালিকানা দান এবং কালো টাকা, *স্পেকট্রামের* বিষয়গুলিকে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। কৃষি ও অন্যান্য জমিকে রিয়েল এস্টেটে পরিবর্তন করাটা ক্ষমতাশালী রিয়েল এস্টেট ডেভলপারদের কাছে বিশাল ব্যক্তিগত ধনদৌলত পাওয়ার উৎস। ডেভলপারদের মধ্যে প্রধান হলো ডিএলএফ গ্রুপ ও তার প্রধান কুশল পাল সিং। এরা দেশের সবচেয়ে বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানি। জলের দরে দিল্লীর চারপাশের কৃষি জমি কিনে সেগুলোকে এরা দামী রিয়েল এস্টেটে রূপান্তরিত করেছে।

আরও সাধারণভাবে, জঙ্গল ও খনিতে, বড় বাঁধে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে, শহরে ল্যান্ডস্কেপের রূপান্তরে, এবং কর্পোরেশনগুলোর হাতে সাধারণের সম্পদ লুঠই আজকের ভারতের আর্থিক অভিজাতশ্রেণীর লক্ষ্য। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ও শিক্ষকদের নন-ফান্ডেড স্বাধীন স্টাডি-গ্রুপ 'পারস্পেকটিভ' এর খানিকটা সুন্দরভাবে দেখিয়েছে তাদের দুটো রিপোর্টে: 'অ্যাবানডনড: ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট' (জানুয়ারি ২০০৮) ও

'কমিউনিটিজ, কমন্‌স অ্যান্ড কর্পোরেশন্‌স' (জানুয়ারি ২০১২) । কারা পুঁজিবাদী বিকাশ প্রক্রিয়ার সুবিধা পাচ্ছে, আর কারা এর শিকার হচ্ছে, এই দুটো বইতে তার হিসাব করা হয়েছে। এর থেকে ভারতের শাসকশ্রেণীগুলির পরিচয় ও তাদের চরিত্র সম্পর্কে জানা যায়। যেমন, কর্পোরেট লুঠের ফলে কচ্ছ জেলায় উপকূলবর্তী মানুষজন ও পরিবেশ ধ্বংস হতে চলেছে, সেই কাহিনী বলা হয়েছে *কমিউনিটিজ, কমন্‌স অ্যান্ড কর্পোরেশন্‌স*-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে— এই কাজটি করছে আদানি গ্রুপের পার্টনারশিপে একটি কোম্পানি। আদানি গ্রুপের নেতা গৌতম আদানি। তাদের রাজনৈতিক শরিক ভারতীয় জনতা পার্টির গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখানে আমরা দেখতে পাই পুঁজিবাদ কীভাবে সরাসরি সমাজবিরোধী কাজকর্মকে পুরস্কৃত করে, আর যারা জনগণের সাধারণ সম্পদের সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে দাঁড়ায় তাদের কীভাবে শাস্তি দেয়।

১৯৯০-এর দশকের গোড়ায় ভারত যে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়, তার ফলে ভারতের বড় বুর্জোয়াদের চরিত্র ও গঠনে পরিবর্তন আসে, আর অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার-বিশ্বব্যাংক অবস্থা স্থিতিশীল করার জন্য নিদান দেয়। এসবের ফলে এদেশের শক্তি ক্ষেত্র, খনি, টেলি-যোগাযোগ, বেসরকারি উড়ান, পরিকাঠামো (পোত, রাস্তা), ব্যাঙ্কিং, বিমা ও অন্যান্য ক্ষেত্রকে বেসরকারি পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া শুরু হয়। এখানে এগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

উদ্যোগ ব্যক্তিমালিকানাধীন, কিন্তু দায় জনগণের

'নিঃস্বকরণের মাধ্যমে সঞ্চয়ের' যে কাহিনী বললাম তা আমাদের মার্কসের 'আর্থিক অভিজাতদের' বর্ণনার অংশবিশেষ মনে পড়িয়ে দেয়। তাঁর লেখা *ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম* বইয়ে জুলাই রাজতন্ত্রের সময় রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার ওপরের ধাপের লোকজনদের সঙ্গে এদের যোগসাজশের কথা মনে পড়ায়। যেমন:

> ফরাসী বুর্জোয়ারা নয়, লুই ফিলিপের রাজত্বকালে শাসন করত তার একটা অংশ— ব্যাঙ্কার, স্টক এক্সচেঞ্জ সম্রাট, রেলওয়ে সম্রাট, কয়লা ও লৌহ খনি ও জঙ্গলের মালিক, তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত জমিমালিক— তথাকথিত আর্থিক ক্ষেত্রের অভিজাতরা। সিংহাসনে আসীন ছিল তারা, চেম্বারগুলিতে আইন ঠিক করে দিত তারা, মন্ত্রী থেকে শুরু করে টোব্যাকো ব্যুরোর সরকারি পদ বণ্টন করত তারা।...
>
> ...শাসক শ্রেণী যেভাবে সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও রাষ্ট্রীয় ঋণকে নিজেদের কাজে লাগায়, সেভাবেই রেলওয়ে তৈরিকেও নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায়। চেম্বারগুলি মূল বোঝাটা রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেয় আর সোনার ফলগুলি ফাটকাবাজ আর্থিক অভিজাতদের হাতে তুলে দেয়।...
>
> ...আর্থিক অভিজাতরা... উৎপাদনের মাধ্যমে নয়, অন্যদের সম্পদ পকেটজাত করে ধনী হয়...

মার্কস এখানে ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের সময়কার পুঁজিবাদের কথা বলছেন। তখন "আর্থিক অভিজাতরা" শিল্প পুঁজিপতিদের ওপর বিজয় অর্জন করেছে— তারা যে শুধু ব্যাংক, স্টক এক্সচেঞ্জ, রেলওয়ে, খনিজ, জমি, জল ও জঙ্গলের ওপরই রাজত্ব করত তাই নয়, রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করত তারা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্লজ্জভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করত। আমরা অবশ্য আজকে ভারতের সঙ্গে তাকে এক করে দেখছি না। মিল শুধু এই যে ১৯৯০-এর প্রথমভাগ থেকে একটি "আর্থিক অভিজাত শ্রেণীর" উত্থান ঘটেছে। ক্রমশ তারাই ক্ষমতার অলিন্দে প্রধান হয়ে উঠছে। তবে ফ্রান্সে ১৮৪২ সালে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে যে রেলওয়ে তৈরি হয়েছিল— সরকার সেখানে দিয়েছিল জমি, মূলত দখল করা জমি, বেশিরভাগ পরিকাঠামো তৈরির খরচ— ব্রিজ, টানেল, রেললাইনের জমি তৈরির খরচ। অন্যদিকে আর্থিক অভিজাতদের নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলি রেললাইন পাতা, রেলস্টেশন তৈরি ও রেল চালানোর খরচ বহন করে, আর তারাই রেল চালানোর দায়িত্ব পায়, যার থেকে তারা লভ্যাংশ পায়। এক কথায়, রাষ্ট্রের খরচে তারা মুনাফা লাভ করে। তাহলেও ফ্রান্সে রেলওয়ে তৈরি হয়েছিল। ১৮৪০-এর দশকের আর্থিক বুর্জোয়াদের উত্তরসূরীরা টাকাপয়সা নয়ছয় করলেও প্রথম জাহাজের বহর বানায়, সুয়েজ খাল বানায়, ইত্যাদি। ১৮৫২ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিলেন লুই নেপোলিয়ান। এর বিপরীতে, ভারতের আর্থিক অভিজাতরা এখনো পর্যন্ত শুধু নিজেদের সম্পদ বাড়িয়েছে, দেশের কোনো সম্পদ তৈরি করেনি।

আজকে ভারতে, পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে— বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, শক্তি ক্ষেত্রে, রেল ও সড়ক নির্মাণ ক্ষেত্রে— পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপই যেন নিয়ম। যেমন ন্যাশনাল হাইওয়েজ ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্ট। ২০০০ সাল থেকে এদের প্রধান কাজ হলো তথাকথিত সোনালী চতুর্ভুজ নির্মাণ (প্রধান চারটি মেট্রোকে সড়কপথে জুড়বার জন্য চার থেকে ছয় লেনের এক্সপ্রেস হাইওয়ে) নির্মাণ, এবং উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম করিডর নির্মাণ। হায়দ্রাবাদ, মুম্বাই ও দিল্লীর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলির আধুনিকীকরণ ও প্রসারণ। রেলওয়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ফ্রাইট করিডর নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে ইঞ্জিনিয়ারিং, জমি অধিগ্রহণ ও তৈরির কন্ট্রাক্ট ছাড়াও প্রকল্পগুলি তৈরি, চালানো ও হস্তান্তর ধরনের পিপিপি প্রকল্পের (পাবলিক-প্রাইভেট-প্রজেক্ট) আর্থিক সংস্থান করা হয়েছে, যাতে বেসরকারি সংস্থাগুলির 'স্পেশাল পারপাজ ভেহিক্‌লগুলি' ভারতীয় রেলওয়ের কাছে নিজেদের জন্য অংশ নির্মাণ করে চালু

করার জন্য ''ছাড়'' পাবে।

সাধারণভাবে বললে পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জাতীয় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে, পিপিপি ব্যবস্থায় সরকার প্রকল্পের জন্য যতটা জমি দরকার তার চেয়ে বেশি জমি দিচ্ছে। সেই বাড়তি জমি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে তার থেকে মুনাফা করার সুযোগ করে দিচ্ছে। কখনো কখনো সরকারের নিজস্ব সম্পদ বেসরকারি ক্ষেত্রে দিয়ে দিচ্ছে, নিয়ম এমনভাবে পাল্টে দিচ্ছে যে যেসব বিশেষ সংস্থা (সরকারেরও তাতে শেয়ার থাকতে পারে) একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো সম্পদ তৈরি করে কাজে লাগাবে, তারা আয়কর ও আমদানি করে ছাড় পাবে। আরও একটা ব্যবস্থা আছে যার মাধ্যমে সরকার মনে করলে প্রকল্পের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ব্যয় ভরতুকি (গ্রান্ট) হিসাবে দিতে পারে, যাতে করে বেসরকারি উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক লাভের গ্যারান্টি পায়। তাই গৌতম আদানি, জি এম রাও, জয়প্রকাশ কাউর ও জি ভি কে রেড্ডির মতো কোটিপতিরা যে দিন দিন আরো সম্পদশালী হবেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে পিপিপি-র কথাই ধরা যাক। এতে যে বেসরকারি উদ্যোগ জড়িত তার নাম দিল্লী ইন্টারন্যাশনার এয়ারপোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড (DIAL)। সংস্থাটি জি এম রাওয়ের জিএমআর গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত। এতে সরকারি সংস্থা এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ২৬ শতাংশ শেয়ার আছে। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই— জয়েন্ট ভেঞ্চারের কাঠামো, জমি লিজ, সম্পদ হস্তান্তর, কর ছাড়ের সময়সীমা, সময়সীমা বাড়ানো, প্রথম অধিকার, জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার, কন্ট্রাক্ট হয়ে যাওয়ার পর আবার ডায়াল-কে ডেভলপন্টে ফি ও এরোনটিক্যাল ও অন্যান্য এয়ারপোর্ট চার্জ বসানোর অধিকার দেওয়া— এ সমস্ত বিষয়েই মন্ত্রীসভা, বেসামরিক উড়ান মন্ত্রক ও এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া জিএমআর গ্রুপের পক্ষে অবস্থান নেয়। এর ফলে সরকার আসলে ডায়াল-কে ৬০ বছর ধরে এয়ারপোর্ট চালানোর সম্পূর্ণ অধিকার দিয়ে দেয় ঐ গ্রুপের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক শর্তে, আর এই শর্তই ৬০ বছর ধরে বলবৎ থাকবে। এই এয়ারপোর্টের ১৫০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে দ্বিতীয় যে বিমানবন্দরের পরিকল্পনা করা হয়েছে সেটির ক্ষেত্রেও প্রথম ডাকা হবে *ডায়াল*-কে। আর এই দ্বিতীয় বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে এমন নিয়ম করা হয়েছে যাতে *ডায়াল*-ই সেটি তৈরি ও চালানোর কনট্রাক্ট পায়। এই বিমানবন্দরের মোট জমির বেশির ভাগটাই *ডায়াল*-কে দেওয়া হয়েছে বার্ষিক ১০০ টাকার লিজে।

তার মধ্যে যে অংশটা *ডায়াল* বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে পারে তার মূল্য, কম করে ধরলেও, ২৪ হাজার কোটি টাকা। প্রথমে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে এই প্রকল্পের টাকা তোলা হবে ইকুইটি ও ঋণের মাধ্যমে। কিন্তু পরে ঠিক করা হয়ে যে প্রকল্পে যা খরচ হবে তার একটা প্রধান অংশ আসবে যাত্রীদের ওপর ডেভলপমেন্ট ফি ধার্য করে। প্রকল্প ব্যয়ের ২৭ শতাংশ, ৩৪১৫ কোটি টাকা, আসে এভাবে। প্রকৃতপক্ষে এটাকে বলা যায় পেছনের দরজা দিয়ে 'ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং'। এর মাধ্যমে আসলে *ডায়াল*-কে বিরাট পরিমাণে পুঁজি ভরতুকি দেওয়া হলো, যাতে করে *ডায়াল*-এর মুনাফার হার অনেক বেড়ে যায়। অর্থাৎ, জিএমআর-এর গোষ্ঠী মাত্র ১৮১৩ কোটি টাকা দিয়ে ৬০ বছর ধরে এয়ারপোর্টের নিয়ন্ত্রণ পেলো, ২৪ হাজার কোটি টাকা মূল্যের জমি বাণিজ্যিক ব্যবহারের অধিকার পেল প্রায় বিনামূল্যে। এই জমিটি ব্যবহার করে *ডায়াল* ভবিষ্যতে মোটামুটি ১৬৩৫৫৭ কোটি টাকা আয় করতে পারবে।

সঞ্চয়ের পরস্পরনির্ভরশীল M-C-M' ও M-M' পথ

লগ্নি পুঁজির ওপর সামাজিক চাপ থাকে 'সঞ্চয়' করার, তা সে M-C-M' পথেই হোক বা M-M' পথে। প্রথম পথটিতে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে টাকা থেকে আরও টাকা আসে। দ্বিতীয় পথেও টাকা থেকে আরও বেশি টাকা আসে, কিন্তু তার সঙ্গে উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক থাকে না। এবার তাদের ভারতীয় অবতারদের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুকেশ আম্বানির কথা ধরা যাকে। কোম্পানির সবচেয়ে বেশি শেয়ার, ইকুইটি পুঁজির ৪৫ শতাংশ, তিনি পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তিনি ব্যাংক অফ আমেরিকার বোর্ড অফ ডিরেক্টরে একজন ডিরেক্টর। কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশন্স-এর আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। বিশ্বের প্রথম দশ জন বিলিওনেয়ারের একজন এই মুকেশ আম্বানি। তিনি যে বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের প্রধান সেটিকে সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার পেছনের দিকে সমন্বিত করা হয়েছে। বলা চলে যে তিনি এর সূত্রপাত করেন। এর ফলে সূতি বস্ত্র থেকে পলিয়েস্টার, পলিয়েস্টার থেকে পেট্রোকেমিক্যাল, পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনিং, আর সামনের দিকে তেল ও গ্যাস এক্সপ্লোরেশন ও উৎপাদন— সব কিছুতেই হাত লাগিয়েছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। মুকেশের পিতা ধীরুভাই আম্বানি ভারতের ধনীদের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে কাছের ছিলেন। শিল্পে লাইসেন্সিং, কর, আমদানি কর ও আমদানির ওপর পরিমাণগত বাধা-র বিভিন্ন নিয়মকে তিনি প্রভাবিত করেছেন। আর যে ধরনের আর্থিক পরিবেশে (১৯৮০-র দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) ইনসাইডার ট্রেডিং-ই ছিল নিয়ম, সেখানে স্টক ডিলার-বাণিজ্যিক প্রোমোটার হিসাবে তাঁর আধিপত্য তাঁকে এমন সব তথ্য দিত, যা দামের ওপর প্রভাব ফেলবে এবং অ-ব্যাংক আর্থিক সংস্থার জালের মাধ্যমে স্টক-মার্কেটে দামকে প্রাইসকে এলোমেলো করে দিয়ে ধন সঞ্চয় করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না।

আসলে এক মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতিতে স্টক মার্কেটের এহেন

অবস্থা এই গ্যারান্টি দেয় যে প্রধান প্রোমোটার-ডিলার জোট চাইলেই তাদের মুনাফা বাড়াতে পারে, ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পারে। পুরো স্টক মার্কেটের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে দীর্ঘকালীন হিসবে, ১৯৮০-র দশকের প্রথম দিক থেকে যে তহবিল হস্তান্তকরণ শুরু হয়েছিল, তা প্রকৃত অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন কী হবে তা অনেকটাই স্থির করে দিয়েছিল, ১৯৯০-এর দশকের নয়া-উদারনীতি সুদৃঢ় হওয়ার বস্তুগত ভিত্তি তৈরি করেছিল। বস্তুগত ভিত্তি তৈরি করেছিল আর্থিক অভিজাত তৈরির, যারা ধনী হবেন M-M' পথে।

এরকম একজন, উদয় কোটাক ও তাঁর আর্থিক বাণিজ্য গোষ্ঠীর খতিয়ান নেওয়া যাক। উদয় কোটাক হলেন কোটাক মাহিন্দ্রা গ্রুপের প্রধান স্থপতি ও প্রোমোটার। এর ছোট শরিক আনন্দ মাহিন্দ্রা, যিনি বহুজাতিক গাড়ি প্রস্তুত সংস্থা মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা-র চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ১৯৮০-র দশকের শেষার্ধ থেকে, বিশেষত ১৯৯২ সালের পর, কোটাক মাহিন্দ্রা গ্রুপ স্টক ব্রোকিং-ডিলিং থেকে অটো-ফিনান্সিং, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, ওয়েল্‌থ ম্যানেজমেন্ট, ফান্ড সিন্ডিকেশন, মিউচুয়াল ফান্ড, লাইফ ইনস্যুরেন্স, প্রাইভেট ইকুইটি ও রিয়েল এস্টেট ফান্ডিং থেকে ২০০৩ সালে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং করে আসছে। বহুজাতিক আর্থিক সিন্ডিকেশনের সঙ্গে, যেমন ১৯৯৬ সালে থেকে গোল্ডম্যান স্যাক্স-এর সঙ্গে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ও সিকিউরিটিজ-এর ক্ষেত্রে, ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ফোর্ড ক্রেডিট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে অটো ফিনান্সিং-এর ক্ষেত্রে, ২০০০ সাল থেকে ওল্ড মিউচুয়ার-এর সঙ্গে জীবন বিমা ক্ষেত্রে, যৌথ উদ্যোগ করে তারা প্রতিযোগীদের সঙ্গে টক্কর দিতে পেরেছে। সিকিউরিটির বদলে টাকা যোগানো, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ও ওয়েল্‌থ ম্যানেজমেন্ট হলো এই গ্রুপের জোরের জায়গা।

প্রকৃতপক্ষে, ২০০৩ সাল থেকে এদের ব্যবসার মধ্যে ব্যাংকিং ও অ-ব্যাংক আর্থিক কার্যকলাপের সমস্ত কিছুই আছে। জনগণের টাকা জমা নেওয়া, মক্কেলের জন্য আন্ডাররাইটিং ও সিকিউরিটি ইস্যু করে টাকা তোলা, মার্কেট মেকিং, এম অ্যান্ড এ-তে সহায়তা, লিভারেজড বাইআউট, ভেঞ্চার ও গ্রোথ ক্যাপিটালের জন্য টাকা তোলা, স্টক/বন্ড দিয়ে সুরক্ষিত ব্রোকার/ডিলার আর্ম-কে স্পেকুলেটিভ ট্রেডিং ও সিকিউরিটির জন্য ঋণ দেওয়া, ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, ও ধনীদের জন্য প্রাইভেট ব্যাংকিং।

আজ এই গোষ্ঠীটি কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক তৈরি করে একটি ব্যাংক-কাম-হোল্ডিং-কোম্পানি হিসাবে কাজ করে। এদের ১৬টি ভিন্ন ভিন্ন শাখা (entities) আছে। ব্যাংকটি বিভিন্ন আর্থিক কোম্পানিকে যে ঋণ দেয় আর বড় অংশটাই দেওয়া হয় নিজেদের সহায়ক ও সাথী কোম্পানিগুলিকে। এতে দুদিক থেকেই ছোঁয়াচ লাগার বিপদ থাকে। এদেশের দেশি ও বিদেশি ব্যাংকগুলির মধ্যে ক্যাপিটাল মার্কেট সম্পর্কিত লেনদেনে সবচেয়ে বেশি লাভ করে এই কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক। মোট অংকের হিসাবে, আবার মোট মুনাফার অংশের হিসাবেও। আজকের ভারতবর্ষে, নিয়ন্ত্রকরা, অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ও সেবি, নিয়ন্ত্রণের কাজটাকে মনে হয় খুব গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে না। কিন্তু বৃহৎ আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকের কাজকর্ম কি *দুশ্চিন্তার বিষয় নয়?* ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ও *সিকিউরিটি সংস্থাগুলিকে* কি জনগণের টাকার একটা বড় অংশ দিয়ে ফাটকা খেলতে দেওয়া যায়? সাথী ও সহায়ক কোম্পানিদের দেওয়া ঋণের একটা বড় অংশ কি স্টক ও বন্ড দিয়ে সুরক্ষিত করে রাখা উচিত নয়। ব্যাংকের কি উচিত অ-ব্যাংক সহায়ক কোম্পানিদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে ব্রোকার ও ডিলারদের ঋণ পাইয়ে দেওয়া?...

আমরা যে আর্থিকীকরণের কথা বলেছি, যা নিয়ে আমরা চিন্তিত, আসলে ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিক থেকেই তা কার্যকর হয়েছে। এর সঙ্গে আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ডিয়া লিমিটেডের, আর পরবর্তীকালে রিলায়েন্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির, একটা বড় সম্পর্ক আছে। এরা বেশি নির্ভর করেছে স্টক মার্কেট থেকে তোলা পুঁজির ওপর। এর ফলে স্টক মার্কেট তেজি হয়ে ওঠে। ২০০০-এর দশকের গোড়ায় কোটাকের মতো নতুন নতুন আর্থিক অভিজাতদের উদয় হয়। এদের বিপরীতে রিলায়েন্স কিন্তু ভারতের অর্থনীতির বাস্তব, আসল অংশে কাজ করত, যার ফলে মুকেশ আম্বানির মাথা আজ আকাশে ঠেকেছে। এবার তেল ও গ্যাসের ব্যবসায় ঐ কোম্পানির আক্রমণের হিসাবে নেওয়া যাক।

পান্না মুক্তা অয়েলফিল্ড ও তাপ্তী গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কার করেছে ও এগুলিকে বিকশিত করেছে পাবলিক সেক্টর কোম্পানি ওএনজিসি। তারপর এগুলিকে তুলে দেওয়া হয়েছে এনরন অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ইন্ডিয়া লিমিটেড (কেম্যান আইল্যান্ডে তৈরি কোম্পানি) ও রিলায়েন্স ইন্ডিয়া-র হাতে। ওএনজিসি থেকে গেছে থার্ড পার্টি কনসর্টিয়ামের অংশ হিসাবে, যাতে মূল সুবিধা পায় ঐ দুই বেসরকারি কোম্পানি। অবশ্য এনরন পরে তার অংশটা ব্রিটিশ গ্যাস এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন ইন্ডিয়া লিমিটেড-কে (এই কোম্পানিও তৈরি হয়েছে কেম্যান আইল্যান্ডে) বেচে দেয় ৩৫ কোটি ডলারে— এই কেনাবেচা হয়েছিল দেশের বাইরে। কিন্তু কেজি-ডিডবলিউএন-০৯/৩-এর (কেজি-ডি৬ ব্লক) ব্যাপারটি কী— যেটি নাকি ভারতের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডার, ২০০২ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্যাস ভাণ্ডার আবিষ্কার, যে আবিষ্কারটি করেছে রিলায়েন্স? যার ফলে রিলায়েন্সের শেয়ারের দাম আকাশে চড়ে যায়! এখন দেখা যাচ্ছে যে কেজি-ডি৫-এ মজুত গ্যাসের পরিমাণ মাত্র ১৯৩

হাজার কোটি কিউবিক ফিট, আগে, ২০০৪ সালে যে দাবি করা হয়েছিল সেইমতো ৫৩০ হাজার কোটি কিউবিক ফিট নয়, আর ২০০৬ সালের দাবিমতো ১১৩০ হাজার কোটি কিউবিক ফিট তো নয়ই।

পান্না-মুক্তা-তাপ্তী ফিল্ডের মতো চুক্তি, যেমন কৃষ্ণা-গোদাবরী বেসিনে দেশের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডার বিকাশের চুক্তি, যেখানে সরকার কার্যত সব বিপদের দায় নেয় আর বেসরকারি কনট্রাক্টর পায় মুনাফার সিংহভাগ। শুধু তাই নয়, বেসরকারি কনট্রাক্টর চুক্তিতে যা লেখা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পুঁজি নিয়োগ করতে পারে, এই সমস্ত চুক্তি থেকে রিলায়েন্স অনেক লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এবং হাইড্রোকার্বন্স-এর ডিরেক্টর জেনারেল মনে হয় সরকারের স্বার্থ দেখার চেয়ে বেসরকারি কনট্রাক্টরের যাতে ক্ষতি না হয়, তারা যাতে পেট্রোলিয়ামের মুনাফার ভাগ ঠিকঠাক পায়, সেটা দেখতেই বেশি উৎসাহী। কিন্তু মৌলিক প্রশ্ন হলো: কৃষ্ণা-গোদাবরী বেসিনের যে ব্লকগুলি রিলায়েন্সকে দেওয়া হয়েছে সেগুলি কি সরকারি কোম্পানি ওএনজিসি-র হওয়া উচিত ছিল না, কারণ ১৯৮৩ সালেই ওএনজিসি এই কৃষ্ণা-গোদাবরী বেসিন যে ভবিষ্যতে ভালোভাবে কাজে দেবে সেটা বুঝতে পেরেছিল? তেল ও গ্যাসের ক্ষেত্রে এটা কি বলা যায় না যে সরকার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজকে জাতীয় সম্পদ পকেটে পুরো তাদের সম্পদ বাড়াতে সাহায্য করেছে?

স্পেকট্রাম অভিজাতবর্গ

একইভাবে টেলিকম পরিষেবার বেসরকারিকরণ থেকে বিশাল অর্থ এসেছে। এতটাই অর্থ যে টেলিকম মন্ত্রী এ রাজার বিতর্কিত 'প্রথমে যে আসবে তাকেই প্রথমে দেওয়া হবে' ব্যবস্থায় ২জি স্পেকট্রাম লাইসেন্স দেওয়ার ঘটনা ২০০৮ সালে ইউনিটেক-এর (ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রিয়েল এস্টেট গ্রুপ, এরা তৈরি করে ইউনিটেক ওয়্যারলেস) সঞ্জয় চন্দ্র (রমেশ চন্দ্রের পুত্র), বা কোটি কোটিপতি বিনোদ গোয়েঙ্কা ও ডিবি রিয়ালটির সাহিদ বালওয়া-র (এদের কোম্পানি সোয়ান টেলিকম) মতো বড় বড় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের আকর্ষণ করে। টেলিকম সম্পর্কিত পূর্ব-অভিজ্ঞতার মতো মৌলিক শর্তও পূরণ না করা সত্ত্বেও এরা ২জি লাইসেন্স পেয়ে যায়, আর তার পর এরা এদের ইকুইটি পুঁজির একটা বড় অংশ বহুজাতিক কোম্পানিদের বেচে দিয়ে বিরাট পয়সা লাভ করে। এই লাইসেন্সের জন্য সোয়ান কেমিক্যাল নাকি ১৫৩৭ কোটি টাকা দিয়েছে, কিন্তু তার পরই এদের ইকুইটি পুঁজির ৪৫ শতাংশ সংযুক্ত আমীরশাহীর এটিসালাত-কে এরা ৪২০০ কোটি টাকায় বেচে দেয়। ওদিকে ইউনিটেক ওয়ারলেস ২জি লাইসেন্সের জন্য খরচ করে ১৬৬১ কোটি টাকা, আর তাদের ইকুইটি পুঁজির ৬০ শতাংশ তারা নরওয়ে ভিত্তিক বহুজাতিক টেলিকম কোম্পানি টেলেনর-কে বিক্রি করে দেয় ৬২০০ কোটি টাকায়। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুপ্রিম কোর্ট এইসব দালালদের রথের চাকার অংশে পরিণত হয়েছে।

কারো কারোর জন্য যদি রিয়েল এস্টেট থেকে টেলিকমে পুঁজি সরানো কঠিন হয়েও থাকে, উল্টো পথে কিন্তু দারুন লাভ হয়েছে। সুনীল মিত্তাল, যার ভারতী এয়ারটেল এখন ভারতের বৃহত্তম মোবাইল সংস্থা, সরকার খুচরো ব্যবস্থায় বিদেশি পুঁজির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত দিলেই যার বাণিজ্যিক সংস্থা ভারতী এন্টারপ্রাইজেস ওয়ালমার্টের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সারা ভারতে খুচরো বিক্রির চেন খুলতে চলেছে, তার ভারতী রিয়ালটি এখন টেলিকম থেকে পাওয়া সম্পদ ব্যয় করার প্রধান উপায়। ভারতী টেলি-ভেঞ্চার্সই (এখন ভারতী-এয়ারটেল) ভারতে প্রথম বেসরকারি অপারেটর হিসাবে মোবাইল টেলিকম পরিষেবা চালু করে— নতুন গড়ে ওঠা পাবলিক সেক্টর টেলিকম সংস্থাগুলি ক্ষেত্রে এ বিষয়ে প্রথমে যেসব বাধা খাড়া করা হয়েছিল, তাতে ভারতীর সুবিধা হয়েছিল, প্রথম এবং একমাত্র হওয়ার সুবিধা পেয়েছিল তারা। মোবাইল টেলিফোনে সরকারি সংস্থা এমটিএনএল-এর প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা বহাল ছিল বেশ কিছুদিন। তারা যখন এই ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার পেল তারপর মোবাইল ব্যবহারের মাশুল অনেকটা কমে যায়।

সরকারি সংস্থার ল্যান্ডলাইন ইতিমধ্যেই ছিল। নতুন মোবাইল ব্যবহারকারীরা সেগুলির সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা পেয়ে যাওয়ায় ভারতী-র সুবিধা হয়। তাছাড়া, ওয়ারবার্গ পিনকাস ও সিঙ্গাপুর টেলিকম থেকে পাওয়া বিশাল অংকের বিনিয়োগ করার ফলে এবং বিভিন্ন টেলিকম সার্কলে যে সব সংস্থা লাইসেন্স পেয়েছে সেগুলিকে টেক-ওভারের ফলে যারা এয়ারটেল কানেকশন কিনত তারা আশা করতে পারত যে এই নেটওয়ার্ক আরও বাড়বে, আর তার ফলে তার এই কানেকশন আরো মূল্যবান হয়ে পড়বে। এর সুবিধা পেল এয়ারটেল।

তাছাড়া এই প্রাইভেট অপারেটররা এখানে অদ্ভুত ধরনের কাজকর্ম শুরু করে। ভারতী ও হাচিশন-ম্যাক্স (হাচিশন-এসার) বেশি দর হেঁকে লাইসেন্স নিয়ে নেয়, আর তার পর নিয়ন্ত্রণকারীদের দিয়ে তাদের স্বপক্ষে নিয়ম পরিবর্তন করিয়ে নেয়। আর, তার পরে, তাদের প্রতিনিধি সেলুলার অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে দিয়ে এমন এক দামের ফরমুলা করিয়ে নেয় যাতে করে তারা বাড়তি ভাড়া (মুনাফা) আদায় করতে পারে। প্রথম বছরগুলিতে, যখন টেলিকম নেটওয়ার্কে বেশির ভাগটা ছিল সরকারি ল্যান্ড-লাইন, তখন ভাড়ার নিয়মাবলী বেঁধে দেওয়া হয়েছিল মোবাইল অপারেটরদের পক্ষে। আর, আগেই বলেছি, অন্য কোম্পানির সঙ্গে মিশে যাওয়া ও অন্য কোম্পানি কিনে

নেওয়া ছিল শিল্পে সঞ্চয়ের ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভোডাফোন কর্তৃক ১১১০ কোটি টাকায় লি কা সেং-এর (লি কা সিং হলেন হাচিশন হামপোয়া-র চেয়ারম্যান) কাছ থেকে হাচিশন-এসারের নিয়ন্ত্রণকারী ৬৭ শতাংশ শেয়ার কিনে নেওয়া। এর পর ২০০১১ সালের জুলাই মাসে ভোডাফোন ৫৪৬ কোটি টাকায় এসারের ৩৩ শতাংশ কিনে নেয়। দেশের বাইরে সম্পন্ন হওয়া এইসব হাতবদলে ভারত সরকার কোনো ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স পান নি। টেলিকম ক্ষেত্রে গত দুই দশকে যে বিরাট অংকের বেসরকারি সঞ্চয় ঘটেছে তার ইতিহাস এইরকম।

'অর্থ, ময়লা আর রক্ত যেখানে মিশেছে'

বিরাট পরিমাণ পুঁজি লাভ করে এসার সাফল্যের সঙ্গে টেলিকম থেকে বেরোলো। কিন্তু এদেশের প্রধান প্রধান কোটি কোটিপতি শশী ও রবি রুইয়ার এসার গোষ্ঠীর টাকা খাটে খনি, ইস্পাত, তৈল ও বিদ্যুৎ শিল্পেও। দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের খনিজ সম্পদে সম্পদশালী দক্ষিণ ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের গ্রামবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য রাজ্য সরকার সালওয়া জুদুম নামে বেসরকারি সশস্ত্র পাহারাদার বাহিনী তৈরি করার পর এসার স্টিল ও টাটা স্টিল কোম্পানি নাকি সালওয়া জুদুমের সঙ্গে চুক্তি করে তাদের রক্ষা করার জন্য এবং জায়গা সাফ করার জন্য। দান্তেওয়ারা, বস্তার ও বিজাপুর জেলায় কর্পোরেট কর্তৃক বিরাট আকারে জমি অধিগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে একের পর এক গ্রাম ফাঁকা করা হয়েছে, গ্রামবাসীদের জোর করে শিবিরে পোরা হয়েছে, আর যারা পালিয়ে গেছে তাদের মাওবাদী আখ্যা দিয়ে ধরে আনা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, এ সবের মধ্যে, ২০০৯ সালে দিল্লীর গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তৈরি স্টেট অ্যাগ্রারিয়ান রিলেশনস অ্যান্ড আনফিনিশড টাস্ক অফ ল্যান্ড রিফর্ম কমিটির সাব গ্রুপ ৪-এর একটি খসড়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, "কেন্দ্রীয় বাহিনীগুলির অস্ত্র ক্ষমতা ও সংগঠন" সালওয়া জুদুমকে সাহায্য করেছে। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই খসড়া রিপোর্টে বলা হয়েছে এই জমি দখল যা "কলম্বাসের পর থেকে সব চেয়ে বড় আদিবাসী জমি দখল", সেটি প্রথমে "পরিকল্পিত হয় টাটা স্টিল ও এসার স্টিল" কর্তৃক, ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক খনির জন্য এরা সাতটির মতো গ্রাম চেয়েছিল। সুরক্ষা বাহিনীর মদতে সালওয়া জুদুম শয়ে শয়ে গ্রামবাসীকে গ্রামছাড়া করে, গ্রামবাসীদের পুলিশ ক্যাম্পে ভরে, অনেককে প্রাণ ও শরীর বাঁচাতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এই খসড়া সরকারি রিপোর্টটিকে এর পরই সরকারিভাবে অস্বীকার করা হয় ও মন্ত্রকের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।

এরকম পরিস্থিতিতে, পরিস্থিতির শিকার, দেশের গরিব গোন্দরা কেন গ্রাম রক্ষা করতে, নিজেদের জীবনে সামান্যতম সুরক্ষা পেতে, তাদের যৌথ প্রয়োজন মেটাতে, জল-জঙ্গল-জমিতে তাদের অধিকারের জন্য মাওবাদীদের দিকে ঝুঁকবে না? (প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলে এরাই মাওবাদী) এটাই তো তাদের পিতৃপুরুষের সম্পত্তি, আর অন্য কারোর তুলনায় তারাই ভালো জানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের তৈরি আর এখনো বহাল ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনের অর্থ তাদের জীবনে কী হতে পারে। ছত্তিশগড়ের স্পঞ্জ আয়রন কারখানার মালিকরা যে দরে খারাপ মানের এই লৌহ আকরিক পায় তার চেয়ে কম দরে বায়লাডিলার লৌহ খনিজ জাপানে রপ্তানি করা হয়। আর এসার পাইপলাইন (২৬৭ কিলোমিটার লম্বা) এই লৌহ আকরিককে ছত্তিশগড়, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ পেরিয়ে বিশাখাপত্তনম বন্দরে নিয়ে যাচ্ছে আরো সস্তা দরে, কিন্তু তার জন্য গোন্দদের মূল্য দিতে হচ্ছে আরো বেশি। তারা তাদের পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছে, হারাচ্ছে তাদের পিতৃপুরুষের জমি, তাদের মাটি থেকে আকরিক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যে জঙ্গলের সঙ্গে তাদের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক সেই জঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে।

লৌহ আকরিক ও কয়লা খনি খুব লাভের ব্যবসা। প্রায় বিনা পয়সায় কালো সোনা পাওয়ার চেয়ে বেশি লাভের আর কী আছে?

প্রায় বিনি পয়সায় অধিগ্রহণ

সিএজি অডিটের একটা খসড়া সম্প্রতি বেরিয়ে পড়েছে। তাতে ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে ইতিমধ্যে খুঁজে পাওয়া কয়লার ব্লক যেভাবে খোলাখুলি অকশন করে সবচেয়ে বেশি দাম যে দেবে তাকে না দিয়ে নিয়ম না মেনে যেমন তেমনভাবে বিতরণ করা হয়েছে তা জানা গেছে। ঐ সময়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কয়লা মন্ত্রক দেখাশোনা করছিলেন। তিনি জানতেন যে সরকারি ক্ষেত্রের কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কয়লার দাম আর বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা, সিমেন্ট ও ইস্পাত কারখানা কর্তৃক অধিগৃহীত এইসব খনিগুলিতে কয়লার দামে বিরাট ফারাক থাকবে। কিন্তু তিনি এটা মানেন নি যে ভারতের নাগরিকদের পক্ষ থেকে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের আইনসঙ্গত অধিকারী হিসাবে ভারত সরকারের দেখা উচিত যে, এই সম্পদের সুবিধার বড় অংশটা ভারতের নাগরিকদেরই পাওয়া উচিত। বর্তমানে কয়লার দাম আর এই খনিগুলিতে কয়লা উৎপাদনের খরচ- এই দুইয়ের ফারাক প্রায় ১০.৭ লক্ষ কোটি টাকা (এর মধ্যে বেসরকারি কোম্পানিগুলি পেল ৪.৮০ লক্ষ কোটি টাকা) আর জমে থাকা আরও ৯০ শতাংশ কয়লা তিনি কোম্পানিদের ছিনিয়ে নিতে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এইসব কয়লা ব্লক যখন দেওয়া হয়েছে তার তারিখ দেখলে দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রী যখন কয়লা মন্ত্রকের দেখাশোনা করছিলেন এই ধরনের ঘটনার

অনেকটাই ঘটেছে সেই সময়ে।

সুবিধাপ্রাপকদের মধ্যে আছে টাটা পাওয়ার, টাটা স্টিল, এসার পাওয়ার, হিন্দালকো, আদানি পাওয়ার, জিভিকে পাওয়ার, আর্সেলরমিত্তাল, বালকো, স্টারলাইট এনার্জি (শেষোক্ত দুটি বেদান্ত রিসোর্সেস বিজনেস গ্রুপের অংশ)।

প্রভাত পট্টনায়ক ২জি স্পেকট্রামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটিকে যে ভাবে সাজিয়েছেন, কয়লার ব্যাপারটাকে সেভাবে সাজালে দেখা যাবে, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত কয়লা ভাণ্ডার বিলিওনেয়ার লক্ষী মিত্তল ও অনিল আগরওয়ালের আর্সেলর-মিত্তল ও বেদান্ত রিসোর্সেস-এর কোম্পানি সহ বেসরকারি কোম্পানিদের হাতে তুলে দিলেন, "'জলের দরে', অন্তত একটা ঠিকঠাক নিলাম করলে যে দাম পাওয়া যেত তার যে অনেক কমে তো বটেই"।২৬ এতে প্রাইভেট কোম্পানিগুলির যে ছপ্পর সে ৪.৮ লক্ষ কোটি টাকা লাভ হলো ভারতের নাগরিকদের তত টাকাই ক্ষতি হলো। এই টাকা "তাদের স্বার্থে খরচ করা যেতে পারতো, কিন্তু তা চলে গেল কিছু ব্যক্তির পকেটে"। যদি ঘুষ নাও দেওয়া হয়ে থাকে, বেসরকারিকরণের ফলে মানুষের যে ক্ষতি হলো সে বিষয়টা তো থেকেই যায়।

এটা আসলে ভারতের নাগরিকদের কাছ থেকে কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি আর্সেলর-মিত্তাল ও বেদান্ত রিসোর্সের সহ বেসরকারি কোম্পানির কাছে অর্থ যাওয়া— ধনের এক প্রগতিবিরোধী পুনর্বণ্টন।

দুনিয়াজোড়া বেসরকারিকরণে পুষ্ট

এখান থেকে আসতে হবে লক্ষ্মী মিত্তাল ও অনিল আগরওয়ালের কাছে। এ দুজনেরই প্রাথমিক সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আর তারপর সেই সম্পদ দারুনভাবে বেড়ে গেছে বেসরকারিকরণের ফলে— নয়া উদারনীতির কালে যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ 'জলের দরে' বেচে দেওয়া হয়েছে— যাকে বলা চলতে পারে নিঃস্বকরণের মাধ্যমে সঞ্চয়। বেদান্তের এরকম এক অমূল্য ক্রয় হলো ২০০১ সালে ভারত সরকারের বেশ লাভজনক পাবলিক সেক্টর সংস্থা বালকো ক্রয়। বেদান্ত রিসোর্সেস-এর একটি সাবসিডিয়ারি সংস্থা স্টারলাইট ইন্ডাস্ট্রিজ বালকো অধিগ্রহণ করে। সেই সংস্থা কংগ্রেস ও বিজেপি, দুই পার্টিকেই পয়সা দিয়েছিল। ২০০৩ সালে ভারতের বর্তমান অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ২০০৩ সালে ছিলেন বেদান্তর এক নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। বেদান্ত হলো ভারতের সবচেয়ে বড় খনি ও অলৌহ ধাতুর ব্যবসা আছে বেদান্তর। এছাড়াও আছে জাম্বিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায়। ভারতের অংশটা বলা যায় তৈরিই হয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানার নানা সম্পদ অধিগ্রহণ করে। এই কোম্পানির ভারতীয় অংশটা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও লৌহ খনিও চালায়। ভারতে বেদান্তর অ্যালুমিনিয়াম ব্যবসায় বালকো ছাড়াও আছে ওড়িশায় লানজিগড় অ্যালুমিনা প্রকল্প, যে প্রকল্পটি এখনও নিয়মগিরি পাহাড় থেকে বক্সাইট উত্তোলন করতে বদ্ধপরিকর, যদিও তাদের ডোংরিয়া কোন্দ আদিবাসীদের বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাবে। এই প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড় পাওয়ার জন্য তারা নয়া দিল্লীতে দরবার করছে।

আর্সেলর-মিত্তালের চেয়ারম্যান ও সিইও লক্ষ্মী মিত্তাল বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে বেশি বিশ্বায়িত ইস্পাত কোম্পানি কিনেছেন। ২০০৫ সালে তিনি ভারতে আসেন একটি মউ দিয়ে। এতে বলা হয়েছে যে মিত্তাল স্টিল ঝাড়খন্ড রাজ্যে একটি ১২০ লক্ষ টনের একটি ইস্পাত কারখানা তৈরি করবে। তারপর ২০০৬ সালে আর্সেলরের সঙ্গে তাঁর কোম্পানি মিলে যাওয়ার পর আর একটা মউ সই করেন তিনি। এটা ওড়িশায় আরেকটা একই ক্ষমতাসম্পন্ন একটা গ্রিন ফিল্ড ইস্পাত কারখানা করার জন্য। কর্নাটকে তিনি একটা ৬০ লক্ষ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্পাত কারখানা গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সব মিলিয়ে ভারতে তিনি মোট ৩০০ লক্ষ টন ইস্পাত কারখানা গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। কিন্তু এই কথা দেওয়াই সার। মিত্তালদের ইতিহাসে নতুন ইস্পাত কারখানা গড়ার ইতিহাস নেই, সে ইতিহাস শুধু অধিগ্রহণের ইতিহাস। ১৯৮৯ সাল থেকে তারা বিশ্ব অর্থনীতির পরিধির দিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ইস্পাত কারখানা জলের দরে কিনে নিচ্ছে। এর মধ্যে আছে পুঁজিবাদে রূপান্তরের সময়ে পূর্ব ইউরোপ ও পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি। ঐ চুক্তিগুলি ছিল বেশ চমৎকার। পেনশন দেওয়ার দায় ও পরিবেশগত দায় থেকে গেল বিক্রেতাদের হাতে, আর ইস্পাত ইন্টারন্যাশনাল (মিত্তালদের পারিবারিক কোম্পানি, পরে তা পরিবারের নিজস্ব সংস্থা এলএনএম হোল্ডিং এনভি-কে অধিগ্রহণ করে এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টিল গ্রুপের সঙ্গে মিলে দিয়ে পরে মিত্তাল স্টিল নাম নেয়) পূর্বতন ক্ষতির জন্য কর ছাড় পায়, তাছাড়া পায় সুবিধাজনক সরকারি ঋণ, বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ। এভাবে অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক সঞ্চয়ের অনেকটা করে ফেলার পর মিত্তাল দীর্ঘ কাঠামোগত সংকটের সুবিধা নিয়ে তিন বড় শক্তির দেশে যে সংকট চলছিল তার সুযোগ নিয়ে উত্তর আমেরিকায় ও পশ্চিম ইউরোপের সংকটগ্রস্ত ইস্পাত কোম্পানিগুলো কিনে নেয়।

সারা বিশ্বে নয়া উদারনৈতিক নীতি, বেসরকারিকরণ যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, এবং পূর্ব ইউরোপে ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পুঁজিবাদে রূপান্তর, ও ব্রিটেনে, যেখান থেকে মিত্তালের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো, সেখানে রাজনৈতিক যোগাযোগ— এগুলিই লক্ষ্মী মিত্তালের সারা বিশ্বের 'ধাতু রাজা' হয়ে ওঠার রহস্য। এখন কিন্তু ভারতে আর্সেলর-মিত্তালের ক্ষেত্রে চলছে একটা অধিগ্রহণের রেস, যাতে করে ঝাড়খন্ড রাজ্যের পশ্চিম সিংভূম জেলার চিরিয়া ও গুয়া এলাকায় দারুন লোভনীয় লৌহখনি লিজে পাওয়ার জন্য চলছে

এই দৌড়। এছাড়া ঐ রাজ্যেরই সারান্দা জঙ্গল এলাকায় রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী মাওবাদীদের ঝেঁটিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করছে (অপারেশন অ্যানাকোন্ডা), যাতে করে এই এলাকার লৌহ আকরিক ভাণ্ডার তোলার ব্যবস্থা সুরক্ষিত হতে পারে, আর তাই তো আর্সেলর-মিত্তালের মতো কোম্পানির আকর্ষণের কারণ।

বাণিজ্য ও রাজনীতি যেখানে মিশে গেছে

লগ্নি পুঁজির কালে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকের মধ্যে, রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি-র মধ্যে ফারাক দিন দিন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতিও এখন এক ধরনের ব্যবসা— বেশ লোভনীয় ব্যবসা। কংগ্রেস আর ভারতীয় জনতা পার্টি— এই দুই রাজনৈতিক দলের কথাই ধরা যাক। যদি এক নির্বাচন থেকে আর এক নির্বাচন পর্যন্ত পুরো একটি নির্বাচন চক্রের হিসাব নেওয়া হয় তাতে এদের টাকাপয়সার সূত্র যা পাওয়া যায় তা তাদের ব্যয়ের এক ক্ষুদ্রাংশও নয়। আজকে নয়া উদারনীতির যুগে, যে যেখানে যখনই ক্ষমতায় থাকছে, তখনই সে আর্থিক অভিজাতদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, তেল, গ্যাস, জঙ্গল, আকরিক লুঠ করতে সাহায্য করছে, স্টকমার্কেটে দাম বাড়াতে বড় বড় বুলদের সাহায্য করছে, নানা ভাবে রিয়েল এস্টেট বাজার বাড়াতে সাহায্য করছে। আর এ সবই ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়াচ্ছে।

দুর্নীতি ও ঘুষ, প্রভাবিত করা, ঘুষ দেওয়া, পয়সা নয়ছয় করা— ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে বিনিয়ন্ত্রণ ও ধনীদের ''অর্থনৈতিক স্বাধীনতা'' শুরু হওয়ার পর এসবের যেন উৎসব চলছে। সাংসদদের ভোট কেনা, বিশেষ কোনো ব্যক্তির জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ কেনা, বড় বড় সাংবাদিকদের কলম কেনা, এমনকি 'ন্যায়'-এর জন্য পয়সা দেওয়া, এনজিও ও সমাজকর্মীদের সমর্থন কেনা। কালো টাকা সাদা করা, জলের দরে খনি, জঙ্গল, জল ও স্পেকট্রাম কেনা। আর এ সমস্তই হয় বাজারের নীতি মেনে। তা সত্ত্বেও টীম আন্না ও তাদের সমর্থকরা, আরও কিছু ভালো লোক এখনও বিশ্বাস করেন যে এই ব্যবস্থাকে লোকপাল ও লোক আয়ুক্ত দিয়ে, কমিশন ও আইন দিয়ে শোধরানো যাবে। পুরো ব্যবস্থাটাই মূল পর্যন্ত পচে গেলে কী করতে হয়? ব্যবস্থার ম্যানেজার কালো টাকার ওপর একটা শ্বেতপত্র তৈরি করে। বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যম ও টেলিভিশনে সেই নিয়ে বিতর্ক চলে। কেউ কেউ ঘোষণা করেন যে, কোন একটি বিল না তৈরি হলে, বা আরেকটি অনুসন্ধানের ব্যবস্থা না করলে অথবা প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা না করলে তাঁরা ''আমরণ অনশন'' করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্যবস্থা এতটাই পচে গেছে যে এসবের মাধ্যমে ব্যবস্থাটিকে সংশোধন করা যাবে না।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (ফ্রান্সে, ১৮৪৮ সালে) সরাসরি আর্থিক আভিজাত্যের বিরুদ্ধে লক্ষ্য স্থির করেছিল, এটি আর্থিক অভিজাত ছাড়াও সমস্ত সম্পত্তিবান শ্রেণীকে রাজনৈতিক ক্ষমতার বৃত্তে ঢুকতে দিয়ে বুর্জোয়াদের শাসনকে সম্পূর্ণ করেছিল। কিন্তু শিল্প বুর্জোয়াদের ক্ষমতার বৃত্তে নিয়ে এলে কি ভারতীয় জনগণের সমস্যার সমাধান হবে? আজ ভারতের শিল্প বুর্জোয়াদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাবান কারা? আইটি ও আইটিই ''উদ্যোক্তারা'' বা ''প্রযুক্তি সম্রাটরা''? আজিম প্রেমজি, শিব নাদার, ইউসুফ হামিদ, সাইরাস পুনাওয়ালা, এন আর নারায়ণমূর্তি, দেশবন্ধু গুপ্ত, পঙ্কজ প্যাটেল, নন্দন নিলেকানি, কে আনজি রেড্ডিরা? কিন্তু ব্যাংক, স্টক এক্সচেঞ্জ, রিয়ালটি ফার্ম ও এসইজেড ডেভলপারদের বাদ দিসে এই তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তারা কি ওয়াল স্ট্রিটের ফিনান্সিয়াল বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে, ভারতের সস্তা 'মানব পুঁজি' নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে? ২০০৮ সালের সরকারি রিপোর্ট অনুসারে ভারতের *সেজ*-এর ৬২ শতাংশ তথ্যপ্রযুক্তি *সেজ*। তাহলে এই তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তারাও কি নিঃস্বকরণের মাধ্যমে সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ায় সুবিধাপ্রাপ্ত নন?

প্রযুক্তি সম্রাটদের ক্ষেত্রে কী বলা যায়? তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মতো ওষুধ শিল্পেও প্রযুক্তি সম্রাটরাও কি ভারতের সস্তা শ্রমের দালাল নন? যারা মূল প্রযুক্তি বুঝে নেয়, কখনো কখনো প্রযুক্তির নতুন চাবিকাঠির বিকাশ ঘটায়, যাতে করে তিন বৃহৎ শক্তির কাছে ওষুধ রপ্তানি করে বিরাট অংকের মুনাফা হয়? আর তথাকথিত ইনোভেচাররা, তারা কি আসলে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট নন, যারা গবেষণা প্রকল্পের গোড়ার দিয়ে অর্থ বিনিয়োগ করেন, পরে মূলত ক্যাপিটাল গেইন হিসাবে বিরাট আকারে মুনাফা লুঠবেন বলে? স্টকমার্কেট ছাড়া, ব্যাংক ছাড়া, লগ্নি পুঁজি ছাড়া কী করবেন এই প্রযুক্তি সম্রাটরা? এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে আমরা একবারও বলছি না যে আর্থিক আভিজাত্যের ফলে ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। ব্যবস্থার নিজস্ব যুক্তির দিক দিয়ে দেখলে আর্থিক অভিজাতরা শিল্প পুঁজিপতিদের মতোই প্রয়োজনীয়।

ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শিল্প বুর্জোয়াদের আবার রাজনৈতিক শক্তির বৃত্তে এনেছিল। কিন্তু প্লেবিয়ান ও সর্বহারাদের নতুন শাসক শক্তির মুঠির মধ্যেই রাখতে হবে। প্যারিসে জুন মাসে (১৮৪৮) তারা বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু সে বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়— ১৫০০ জন নিহত হয়, তাদের স্বপ্ন ভেঙে যায়। কিন্তু ১৮৭১ সালে তারা আবার ইতিহাসের জোয়ারে ফিরে আসে। সে বছর মার্চের মাঝামাঝি থেকে মে-র শেষাশেষি পর্যন্ত তারা কমিউন প্রতিষ্ঠা করে। আবার তাদের দমন করা হয়। এবার আরও বর্বরতার সাথে। কিন্তু কমিউনার্ডরা পুরনো রাষ্ট্রের সবচেয়ে খারাপ দিকটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় এক নতুন

ধরনের সরকার, প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এরকম এক সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টা আসে জনতার নৈতিক অর্থনীতির প্রতি অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব থেকে। ভারতেও গরীব ও মধ্য কৃষকরা, নিঃস্ব মজুরি শ্রমিকরা, কারিগররা, নিম্ন মধ্য শ্রেণীর মানুষরা, যারা টিকে থাকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের মধ্যে একটা মূল্যবোধ, নীতিনিয়ম ও বিশ্বাস আছে অর্থনীতি নিয়ে, পলিটি নিয়ে, সমাজ নিয়ে। একটা বিপ্লবী সময়ে তারা হয়তো পুঁজিবাদের মূল্যবোধ, নিয়মনীতি ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবে। তারা মনে করে যে বর্তমান পুঁজিবাদী নীতি ও কার্যকলাপ নৈতিকভাবে ভ্রান্ত।

পুঁজিবাদের দু ধরনের কাজ রয়েছে যা মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। এখানে যারা সিদ্ধান্ত নেয় তারা উদারনৈতিক রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামোর বাইরে, বাজারে ও অর্থনীতিতে তাদের অবস্থান। রাষ্ট্র আবার সম্পত্তি ও চুক্তির সুরক্ষার অধিকারের গ্যারান্টির মাধ্যমে তাদের সুরক্ষা দেয়। অর্থনীতিতে নিঃস্ব মজুরি শ্রমিক ও গরিব কৃষকের শোষণই নিয়ম। কিন্তু জনতার নৈতিক অর্থনীতির নিয়মে তা কিন্তু কুৎসিত। ফাটকাবাজি ও মজুতিদারিও তাই। অন্য যেসব দুর্নীতিগ্রস্ত কাজ জনতার নৈতিক অর্থনীতির নিরিখে কুৎসিত তা হলো প্রয়োজন আর সম্পত্তির মধ্যে ফারাক, যা পুঁজিবাদের যে কোনো মূল্যে নিজের মূল্য (বাজারের নিরিখে) বাড়ানোর ফল।

ভারতের সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাবান বাণিজ্য সংস্থা তার হয়ে লবি করে যারা, তাদের টাকা দিয়ে তাদের নিজেদের লোককে এদেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ মন্ত্রীর পদে বসানোর ব্যবস্থা করেছে —এটা এদেশের সাধারণ লোককে বুঝিয়ে বললে জনতা কি বিরক্ত ও ঘৃণা বোধ করবে? কিংবা ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকে মণিশংকর আইয়ারকে মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে ওয়াশিংটনের চাপে (ওরা চায়নি যে ইরান-পাকিস্তান-ভারত গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প হোক) সে জায়গায় মুরলি দেওরাকে বসানোর ঘটনায়? অবশ্য, সামন্ততান্ত্রিক সময়ে রাষ্ট্রীয় পদ কেনা যেত খোলাখুলিভাবেই। সেসময় কোনো রাষ্ট্রীয় পদে আসীন ব্যক্তি তাঁর পদকে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত লাভ করার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, বরং সেটাই ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু আজ, একবিংশ শতকের ভারতেও, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ মনে করেন না যে এতে অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে। আদালত নির্দেশ না দিলে তিনি এ রাজাকেও পদে আসীন রাখতেন। আর্থিক অভিজাতরা যখন সবকিছু চালাচ্ছে তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, সরকারি ও বেসরকারি- এগুলির মধ্যেকার ফারাক কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। বাণিজ্য আর রাজনীতি এত বেশি পরস্পর সংযুক্ত, রাজনীতি যেন বাণিজ্যেরই একটি ধরন, বেশ লোভনীয় একটি ধরন। কিন্তু এটা বলার সময় মনে রাখতে হবে যে রাজনীতিবিদ এ রাজা ছিলেন তাঁর ধনী ও ক্ষমতাবান পুঁজিপতি মক্কেলদের হাতের পুতুল, ইচ্ছুক পুতুল, যেমন মুরলি দেওরা ওয়াশিংটনে তাঁর মনিবদের হাতের ইচ্ছুক পুতুল।

অভিজাতরা ও জনতা

এক নয়া-বাস্তববাদী লেখক তাহলে কেমনভাবে আজ ভারতে একজন আর্থিক অভিজাতের ছবি আঁকবে? এমন সব অভিজাত আছে যাদের কোম্পানির মূল অফিস আমস্টারডামে, যারা লন্ডনে বসে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্ব জুড়ে খনি চালায়, ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উৎপাদন ও বাণিজ্য চালায়, পরিবারের সম্পত্তি ডাচ অ্যান্টিলসে রেখে দেয়, মেয়ের বিয়ের জন্য ভার্সাই প্রাসাদ ভাড়া করে। বিশ্ব বাজারে তারা প্রোথিত, তাদের সঞ্চয়ও হয় বিশ্ব স্তরে, এরা নয়া উদারনীতিতে সিক্ত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের সঙ্গে এদের মাখো মাখো সম্পর্ক। নীতি তৈরির উচ্চ স্তর, পরিকল্পনা পর্ষদ ও নর্থ ব্লককে অধিকার করতে হবে। তাই অভিজাতদের ফাউন্ডেশনগুলি অ্যাকাডেমিক থিংক ট্যাংক গড়তে টাকা দেয়, "বিশ্ব মানের" বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে টাকা দেয়, টাকা দেয় সেই ধরনের এনজিও-দের যারা ভালো গভর্ন্যান্সের কথা ছড়িয়ে দেবে, কী ধরনের সামাজিক কাজকর্ম হবে সেটা ঠিক করে দেবে। "অর্থনৈতিক সম্পদকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদে রূপান্তরিত করার, টাকাকে ক্ষমতায় রূপান্তরিত করার এর চেয়ে ভাল উপায় আর কী আছে?" এর নীতি হলো বাজারে মূল্য যাচাই করা। তাই সব রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ডিম একই ঝুড়িতে রাখা চলবে না। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা, সংঘ পরিবার স্বদেশির কথা মুখে বলতে পারে, কিন্তু সেটা তাদের আসল এজেন্ডা নয়। তাছাড়া এই অভিজাতদের পক্ষে বৈদিক সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার চেয়ে, আজকের বিশ্বায়নের দিনে সেই সোনালী যুগ ফিরিয়ে আনার চেয়ে ভালো কাজ আর কী হতে পারে?

জাতীয় হোক বা বহুজাতিক, পরিবার ও বাণিজ্য হলো ভারতীয় আর্থিক অভিজাতদের বিশ্বে দুটি প্রধান প্রতীক। তার সব সিদ্ধান্তই তার ব্যবসার ও তার পরিবারের ব্যবসার স্বার্থে পরিচালিত। তাদের পক্ষে কী ভালো সেটাই ব্যাপার। এই অভিজাতরা ভদ্র, সভ্য ধরনের, বুঝদার, এমনকি পরিবারের মধ্যে তারা ভালও বাসে। কিন্তু বাইরে তার শ্বাপদের মতো। পরিবারের সঙ্গে যুক্ত প্রধান প্রধান রাজনীতিবিদ, বিচারক, নিয়ন্ত্রক, ব্যবসায়ী ও তার ব্যবসার উপর নির্ভরশীল যারা (যারা তার নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়ে তার সুবিধা নেয়), পুলিশ অফিসার, সংবাদমাধ্যমের লোকজন, স্টক মার্কেটের দালালরা, এরা মূলত এই মুনাফার ব্যাপারটা বোঝে, এরা তার পকেটে থাকে। তার

একটা ঔদ্ধত্য আর দাম্ভিকতা আছে। তাকে ভেদ করে যে সব দেখা যায় না। তার দৃষ্টি শীতল, কঠিন। সুবিধা পেলে সে কিছু টিভি চ্যানেল কিনে নেবে যাকে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। তার সংগ্রাম হলো প্রতিযোগী পরিবারগুলির বিরুদ্ধে, প্রতিযোগী ব্যবসার বিরুদ্ধে। সে সেই অতি অল্প ভারতীয়দের মধ্যে পড়ে যাদের বিরাট পরিমাণ অর্থ ও ক্ষমতা রয়েছে। নতুন ভারতে তার মন্দির হলো ভয়ানক অসাম্যের এক অশ্লীল প্রতীক। মানবহিতৈষণা ও কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাও দেখানো যেতে পারে— যদি তা পরিবারের জন্য ও ব্যবসার জন্য ভালো হয়। আর করাও হয়, কারণ সে তো আইনের মধ্যে কাজ করা পাতি ব্যবসায়ী নয়। সত্যি কথা বলতে কী, এই অভিজাতরা যে ক্ষমতা পায় সেটা তারা পায় আইনি ও নৈতিক সব কোড অস্বীকার করেই।

কিন্তু কীসের পদচিহ্ন এই অভিজাতদের চিন্তায় ফেলে? এটা নির্ভর করছে এই অভিজাতরা কোথায় শিকার করছে তার ওপর। যদি ছত্তিশগড় বা ঝাড়খন্ড হয় যেখানে সে খনি থেকে আকরিক তোলার অধিকার পেয়েছে, বা নয়া দিল্লীর খনি মন্ত্রক হয় যেখানে তারা ভালো গভর্ন্যান্স নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু পয়সা পেলে নিয়ম পাল্টে দিতে পারে, সেখানে সে স্বচ্ছন্দ। সেখানে ''সময়ের বালুকাবেলায় পদচিহ্ন''-র মতো ব্যাপার নিয়ে তাদের মাথা ঘামাতে হয় না। আমরা কি বেশি কঠোর হচ্ছি, বেশি সিনিক্যাল? না। এই বিশ্বে শ্বাপদদের শাস্তি হয় না। তারা ব্যবসা আর রাজনীতির সংযোগস্থলে, বা ব্যবসা হিসাবে রাজনীতিতে।

এই অভিজাত আর তাদের সম্পদের বিপরীতে আছে ''জনতা'', যাদের প্রতিদিন বাঁচতে হয় পকেটে ২০ টাকার কম নিয়ে। এই জনতা সর্বদাই বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে ১৮২৯৩৬ জন কৃষক ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। তাঁদের আত্মা এখনও শান্তি পায় নি। *দ্য হিন্দু*-র গ্রাম-সম্পর্কিত বিষয়ের সম্পাদক পি সাইনাথ এইসব আত্মহত্যাকে ''ইতিহাসে এই ধরনের মৃত্যুর সবচেয়ে বড় ধারাবাহিক ঘটনা'' বলেছেন। কিন্তু যারা বেঁচে থাকল, সেই ৮০ কোটি দরিদ্র নিঃস্ব মানুষের, ''জনতা''-র কী হবে? তাদের অবস্থার সঙ্গে এই ধনী অভিজাতদের অবস্থার তুলনা করুন। তাহলে বুঝতে পারবেন যে মার্কসের সেই কথাগুলো এখনো সত্য: ''জাতীয় সম্পদ তার নিজস্ব চরিত্রের কারণেই মানুষের দুঃখকষ্টের সঙ্গে একীভূত''। বিশাল আর্থিক সংকট চলছে— দ্বিতীয় অধ্যায়, হয়তো তৃতীয় অধ্যায়ও আসছে— এই সংকট হয়তো শেষ পর্যন্ত শিল্প ও বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যকে ধ্বংস করে দেবে, যার ফলে আর্থিক অভিজাতদের রাজত্ব আরও অসহ্য হয়ে উঠবে।

এরকম সময় জনতার নৈতিক অর্থনীতির প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল ও গ্রহণযোগ্য হতে হয়। ১৮৭১ সালে প্যারিসের কমিউনার্ডদের নেতারা ছিলেন প্রুধো ও ব্লাঁকি পন্থী। কিন্তু ''জনতা''র নাড়ি তাদের নিজস্ব সংস্কার বাদ দিয়ে তাদের সতর্ক করে দেয় যে তাদের সম্ভবপর প্রথম মুহূর্তেই পুরনো রাষ্ট্রের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলোকে ছেঁটে ফেলতে হবে, শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের নিজেদের ডেপুটি ও অফিশিয়ালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনুমতি দিতে হবে, ঘোষণা করতে হবে যে তাদের সবাইকে যে কোনো মুহূর্তে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে। ''হ্যাঁ, আমরা যদি জানতে চাই যে সর্বহারা একনায়কত্ব কীরকম, আমাদের প্যারি কমিউনের দিকে তাকাতে হবে। ওটাই সর্বহারা একনায়কত্ব।'' আমাদেরও ''জনতা''র নাড়ি দেখতে শিখতে হবে।

পুঁজিবাদী নিয়মকানুন ও যে কোনো উপায়ে সম্পদ সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে ভারতের বামপন্থীরা ''জনতা''র স্বাভাবিক মিত্র। ভারতে ১৯৯১ সাল থেকে যে ''নিঃস্বকরণ'', না, ''চুরি'' চলছে, তা মূলত সামাজিক শ্রম ও বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও শ্রমিকদের ত্যাগে গঠিত রাষ্ট্রীয় ''জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ। এইসব চোরডাকাতরা নয়, ''জনতা''-ই এ নিয়ে বেশি ভাবিত। ভারতের মাটি এখন অত্যন্ত বেশি হারে শোষিত হচ্ছে, কিন্তু অভিজাতদের হাতে সামাজিক সম্পদ ''চুরি'' ও প্রকৃতিমাতার থেকে হরণ দিন দিন খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে। আমরা যখন বলি যে এই অভিজাতদের সম্পদ তৈরি হয়েছে মানুষের শ্রমশক্তি ও প্রকৃতিকে শোষণের মাধ্যমে, তাকে টাকায়, তারপর স্টক, বন্ড ও অন্যান্য আর্থিক হাতিয়ারে পরিণত করে, এবং তার থেকে আবার টাকা ও পণ্যে পরিণত করে— জনতা তার অর্থ ঠিকই বুঝবে।

বামপন্থীদের কাছে আজ প্রয়োজন হলো জনতাকে আঁকড়ে ধরা। তার পরই কেবল মাস লাইনের নেতৃত্বের নীতির মাস লাইন (জনগণের কাছ থেকে, আবার জনগণের কাছে) অনুশীলন করা যাবে। অবশ্য জনতা যা চাইবে বামপন্থীরা সেটাকে ঠিক মনে না করলে সেটা করবে না, কিন্তু বামপন্থীদের যেটা ঠিক মনে হবে সে সম্পর্কে জনতাকে একমত না করে কখনোই করা যাবে না।

নোনাডাঙায় নতুন করে শাসকদলের আক্রমণকে ধিক্কার!

পত্র পত্রিকা থেকে

‘আধার’ প্রকল্প: জীবনে নেমে আসতে পারে নিঃসীম আঁধার

দীপাঞ্জন সারখেল

কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত Unique Identification Authority of India (UIDAI) দেশের সমস্ত নাগরিকদের একই রকম, এক বিশেষ ধরনের ‘পরিচয়পত্র’ দেওয়া শুরু করেছে। ১২ ডিজিটের কার্ডটি সংগ্রহ করতে প্রতিটি ভারতীয়কে তার নিজস্ব বায়োমেট্রিক তথ্য অর্থাৎ হাতের ১০ আঙুলের ছাপ, চোখের মণির ছবি তৎসহ ফটো জমা দিতে হবে। বলা হচ্ছে আবেদন জমা দেওয়ার ২০-৩০ দিনের মধ্যে এই কার্ড হাতে পাওয়া যাবে। এই তথ্যগুলি স্থায়ীভাবে কম্পিউটারে রক্ষিত থাকবে। এই প্রকল্পের ব্রান্ড নাম ‘আধার’ (Aadhaar) । একবার ‘ডেটা’ জমা পড়লে বিভিন্ন তথ্যের হেরফের করে দ্বিতীয় বার আই কার্ড পাওয়া যাবে না। ডুপ্লিকেট নামেও বার করা যাবে না। কারণ বায়োমেট্রিক তথ্য সারাজীবনে দ্বিতীয়বার পরিবর্তন সম্ভব নয়। নবজাতক শিশুও এই কার্ড পেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশুটির ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হলে তাদের বাবা-মাকেই সন্তানদের যাবতীয় তথ্য আপ-ডেট করাতে হবে। বয়সের প্রমাণপত্র না থাকলে, আন্দাজমত বয়স দেওয়া যাবে। স্ত্রী, পুরুষ এমনকি ‘ট্রানসজেন্ডার’ মানুষও ‘আধার’ কার্ড পাওয়ার অধিকারী। সংগৃহীত সমস্ত তথ্য সত্য কিনা বিশেষ পদ্ধতিতে তা আবার যাচাই করে নেওয়া হবে। দেশের ১২০ কোটি মানুষকে আধার কার্ড সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উইপ্রো, কোম্যাট টেকনলজি, অ্যালানকিট, ভার্গো প্রভৃতি খ্যাতনামা বিদেশি কোম্পানি সহ প্রায় ২০০ এজেন্সিকে নিযুক্ত করেছে। বাজেট ধরা হয়েছে, কমপক্ষে ৪৫ হাজার কোটি টাকা। বেসরকারি ইনফোসিসের প্রাক্তন কো-চেয়ারম্যান নন্দন নিলেকানিকে এই প্রকল্পের শীর্ষে বসানো হয়েছে। শুধু তাই নয় সমগ্র প্রকল্পটি যে সরকারের, এ কথা বোঝাতে, নন্দন নিলেকানিকে করা হয়েছে পূর্ণ ক্যাবিনেট মন্ত্রী। এই প্রকল্পের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন আইএএস অফিসার রামসেবক শর্মা।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১০-এ, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন ও ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, মহারাষ্ট্রের আদিবাসী গ্রাম ‘টেম্বলির’ রঞ্জনা সোনাওয়ানে’কে প্রথম কার্ড প্রদান করে, এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ২০ অক্টোবর রাজস্থানের ডুডু গ্রামে আবার কার্ড আধার কার্ড বিতরণ আনুষ্ঠানে মনমোহন বলেন, ‘ইতিমধ্যে ২১ কোটি মানুষ এই কার্ড পেয়েছেন। ২০১৪ সালের মধ্যে ৬০ কোটি মানুষের হাতে আধার কার্ড পৌঁছে যাবে। ২০১৮ সালে সারা দেশে এই কাজ সম্পূর্ণ হবে।’ ছাত্রদের মধ্যে এই পরিচয়পত্র বিতরণ করার উদ্দেশ্যে ‘UIDAI’ ইতিমধ্যে ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ববিদ্যলয় অর্থাৎ ইগনু-র সাথে মৌ চুক্তিও করেছে।

আধার কার্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটা বাধ্যতামূলক নয়। অথচ বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিভিন্ন এজেন্সি জনগণনার সাথে আধার কার্ডের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছে। তলে তলে বলা হচ্ছে ভোটার, পাশপোর্ট, প্যান বা রেশন কার্ড নয়, আধার কার্ড হল আসল পরিচয়পত্র। মোবাইলের সিমকার্ড, রেশনকার্ড, বিভিন্ন ধরণের ভাতা, ভরতুকি, রেল-বিমান টিকিট, ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ছাত্রবৃত্তি, শেয়ার, পেনশন, পাশপোর্ট, বীমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই কার্ডের সাহায্য নিতে হবে। অর্থাৎ এই কার্ড গ্রাহ্য হবে। এই রকম ভিতর ভিতর বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষ আধার কার্ড পাওয়ার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে লাইন দিচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনমোহন বলেছেন যে গণবণ্টন ব্যবস্থা (পিডিএস) সহ অপরাপর নানাবিধ সামাজিক প্রকল্পে, সরকার যে অনুদান, ভরতুকি বা খয়রাতি সাহায্য দিয়ে থাকে, যথার্থই তা সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছায় না। সঠিক মানুষের হাতে তা পৌঁছানোর জন্য সরকারের হাতে তথ্য থাকা জরুরি। সরকার একে ‘টার্গেটেড সাবসিডিজ’ বলছে। অর্থাৎ তাদের মতে এর সাহায্যে প্রাপকেরা সরাসরি টাকা পাবে। বলা হচ্ছে, “এই সব সাহায্য মাঝপথে লুঠ হয়ে যায়। আধার প্রকল্পের ফলে এই দুর্নীতি বন্ধ হবে। সরকারের ভরতুকির অঙ্ক কমবে। সমস্ত মানুষের তথ্য হাতে আসলে কোষাগার স্ফীত হবে।” অর্থাৎ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিষ্পেশন করে কর আদায়ের সুযোগ ও ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। ঘটনা হলো, সমাজের সর্বস্তরেই আজ দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। মন্ত্রী, নেতা, বিচারপতি, সরকারি কর্মচারী, আমলা, দোকানদার, ছোট-বৃহৎ পুঁজির মালিক, পুলিশ, প্রশাসনের অধিকাংশটাই চোর, ঠগ, দুর্নীতিগ্রস্থ ও অসৎ। মনমোহনের সরকারও কয়লা, টু-জি স্পেকট্রাম, শেয়ার, জমি, আবাসন, বিদেশি মুদ্রা প্রভৃতি নানা কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। দেশে আইন আছে। আছে দুর্নীতি দমন শাখা। পুলিশ, ভিজিল্যান্স ইত্যাদি দপ্তরগুলি দুষ্কৃতি দমনে নিযুক্ত। এদের পিছনে বছরে শত শত কোটি টাকা খরচ হয়। এতসব করেও দুর্নীতির কেশাগ্র স্পর্শ করা যায়নি। দেশ ডুবছে অতল পাঁকে। আর কংগ্রেস তথা মনমোহন সোনিয়ার উর্বর মস্তিষ্কজাত আধার কার্ড দেশে দুর্নীতি দূর করবে! একথা শুনে তো ঘোড়াতেও হাসবে।

আশ্চর্যের বিষয় ১২০ কোটি মানুষকে জড়িয়ে যে কর্মকাণ্ড মনমোহন সরকার তথা কংগ্রেস নিল, সে বিষয়ে প্রকাশ্যে অথবা লোকসভায় কোন আলোচনা, বিতর্ক, ভোটাভুটি এসব কিছু হল না। লোকসভায় কোন প্রস্তাব পাশ হল না। হাজার হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়ে গেল। ‘UIDAI’ নামে সংস্থাও গঠন হল। তাও আবার দেশি-বিদেশি নানা ধরনের এজেন্টদের মাধ্যমে। এই উৎস থেকে কী ধরনের বিপদ সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে মনমোহন-সোনিয়ার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। থাকলে ওই প্রকল্পে সতর্কতা বা রক্ষাকবচ থাকত। তা নেই। থাকতেও পারে না। অথচ মনমোহন বলছেন সমস্ত তথ্যই গোপন থাকবে। মনমোহন সিং-এর

যেমন রোবটের মত চলাফেরা, কথাবার্তা ও আচরণ তেমনই। যে দেশের ৮৩ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, সেদেশে এত বিপুল অর্থ ব্যয়, এতবড় অপচয়, অথচ এর ফলে জনজীবনের কোন আর্থিক বা মানসিক উন্নতি সাধন হবে না। জীবনযাত্রার মানের বিন্দুমাত্র উন্নতি হবে না। তাহলে এই ধরনের প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি? তা কি কখনও মহৎ বা জনহিতকর হতে পারে? সমস্ত তথ্যই কম্পিউটার হ্যাকিং করে অথবা বিদেশি এজেন্টদের মাধ্যমে মুহূর্তে বিদেশে পাচার করতে আধুনিক প্রযুক্তিতে তো কয়েক সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগার কথা নয়। যেখানে সামরিক বাহিনীর তথ্য ফাঁস হয়ে যায়, সেখানে আধার কার্ড-এর তথ্য গোপন থাকতে পারে কি?

১৯৯৯ সালে ভারত-পাক সংঘর্ষ অর্থাৎ কার্গিল যুদ্ধের সামান্য পরে ২০০০ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার 'পরিচয় নম্বর' নামে এক প্রকল্প শুরু করে। বলা হয় এই 'পরিচয় নম্বর' সমস্ত ভারতবাসীর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। বিজেপি জানত 'মাল্টিপারপাস আইডেণ্টিটি কার্ড' দ্বারা দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর রাষ্ট্রের বে-আইনি হস্তক্ষেপ ঘটবে। নাগরিকের প্রাইভেসিও হবে বিনষ্ট। এবং অবশ্যই এই প্রকল্প ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে ব্যক্তির জীবনযাপনের (প্রাইভেসি) অধিকারকে আঘাত করবে। তৎসত্ত্বেও বিজেপি সরকার ক্ষমতার জোরে তা চালু করার চেষ্টা করে। যুক্তি ছিল 'দেশের নিরাপত্তা মজবুত করা'। পরবর্তীতে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মনমোহন বিজেপির কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা নেন। তিনি মুখরোচক শ্লোগান জুড়ে দিয়ে বলেন UIDAI -এর উদ্দেশ্য হল 'উন্নয়ন, 'নাগরিকদের প্রতি গোয়েন্দাগিরি নয়।' প্রকৃতপক্ষে বিজেপির হীন উদ্দেশ্য ও প্রকল্পের সাথে মনমোহনের আধার প্রকল্পের কোন তফাৎ নেই। শুধু অসাধু কৌশলগত প্রয়োগ ও ভাষার মারপ্যাঁচ ছাড়া। ভারতের ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর প্রাক্তন অধিকর্তা এ কে দোভাল মনমোহনের উন্নয়নের শ্লোগানকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এ প্রকল্প (আধার) শুরুই করা হয়েছিল বিদেশি ও অননুমোদিত ব্যক্তিদের তাড়ানোর জন্য। এখন তার লক্ষ্যকে অন্যরকম করা হচ্ছে। উন্নয়নের লক্ষ্য বলে প্রচার করা হচ্ছে যাতে প্রতিবাদ না ওঠে।" (*দি হিন্দু*, ২১/১০/১২)

অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকায়ও এ ধরনের পরিচয়পত্র প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। সে দেশগুলির জনসংখ্যা ভারতবর্ষের চেয়ে অনেকগুণ কম। অর্থনীতিও মজবুত। তবুও বিপুল অর্থব্যয়ে ও স্বাধিকার হরণের কারণে সেই প্রকল্পগুলি বাতিল হয়। বাতিল হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ হল সে দেশগুলির মানুষের তীব্র বিরোধিতা। ওই দেশের মানুষ মনে করে এই পরিচয়পত্র তাদের স্বাধীনতা ও প্রাইভেসি বিনষ্ট করবে। ব্যক্তিজীবনে গোপনীয়তা ও অধিকার ধ্বংস হবে। ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র সচিব বলেছেন যে, "এই পরিচয় নম্বর নাগরিকদের অন্দরমহলে ঢুকে চোখ রাঙাতে পারে। যা আমরা করতে পারি না।" ভারতের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী সহ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার বলেছেন, "ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার কাছ থেকে এ ব্যাপারে ভারত সরকারের শিক্ষা নেওয়া উচিত।"

গুজরাটের নৃশংস দাঙ্গায় সংখ্যালঘু নিধনে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। এই নিধনযজ্ঞে খুনি ও দাঙ্গাবাজরা বিজেপি সরকারের পরিকল্পনা ও মদতে ভোটের তালিকা দেখে সংখ্যালঘুদের চিহ্নিত করে ও হত্যা করে এবং দাঙ্গা বাধায়। আধুনিক প্রযুক্তির আধার প্রকল্পে রক্ষিত এই নাগরিক তথ্য হাতিয়ে নিয়ে যে কোন ব্ল্যাকমেলিং, হয়রান, মিথ্যা মামলায় ফাসানো, ভয়, হুমকি, ভোটে রিগিং সহ যে কোন অন্যায় অনৈতিক অথবা সন্ত্রাসমূলক কাজ সংঘটিত করতে পারবে। রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে।

তাই প্রতিবাদ উঠেছে। প্রতিবাদ উঠছে সর্বত্র। দেশজুড়ে চলছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ। বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম এরা কেউই এই প্রশ্নে জনগণের পাশে নেই। হিটলারি এই গোয়েন্দাগিরির এখনই অবসান হওয়া দরকার। মানুষের জীবনে নাম ও ঠিকানাপঞ্জীর সাথে জেলখানার কয়েদি ও জার্মান ইহুদিদের মতো দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে চিরকালীন একটা নম্বর। সেই নম্বরই হতে চলেছে মানুষ ও মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচয়। ২০০১-২০১০-এর মধ্যে এ দেশের জেল ও পুলিশ হেফাজতে মানুষ খুন হয়েছে ১৪ হাজার। শুধু পশ্চিমবঙ্গে ৪০ হাজার মানুষ বিনা বিচারে জেলখানায় বন্দী আছে। এই অবস্থায় আধার কার্ড জনজীবনে প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করার ভিত্তিভূমি রচনা করবে। তুচ্ছ কারণে রাষ্ট্র হানা দেবে নাগরিক জীবনের অন্দরমহলে। এমনকি শয্যাগৃহে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, জীবনের গোপনীয়তা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হবে। নিজভূমে জীবনভোর থাকতে হবে রাষ্ট্রের চোখ রাঙানির সামনে, বেয়নেটের ডগায় ও বুটের তলায়। এই তথ্যেরই সাহায্যে সুনামির মতো বারবার হানা দেবে জনজীবনে সাম্প্রদায়িকতা, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, আঞ্চলিকতাবাদ, জাতি সংঘর্ষ, ধর্মীয় হানাহানি, বর্ণগত বিদ্বেষ ইত্যাদি। এইগুলি সংঘটিত করার টাটকা উপাদান এসে যাবে দুষ্কৃতীদের হাতে। মানুষের রক্তঘামে সিঞ্চিত ও কষ্টার্জিত হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ ব্যয় হবে মনুষ্যত্ব হত্যা ও ফ্যাসিবাদী সমাজ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় মানুষের বিরুদ্ধেই এবং সভ্যতা ধ্বংসকারী যুদ্ধের খরচ হিসাবে। আধার কার্ডের হাত ধরে নেমে আসতে পারে আমাদের সমাজ জীবনে নীরন্ধ্র ও গহন আঁধার। তাই আজ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে মানুষের এই সমাজটাকে রক্ষা করার জন্য। আধার কার্ড একযোগে বয়কট করা উচিত সকলেরই। একাজ যদি না করি; সেই একদিন, যেদিন নিজে আক্রান্ত হব, চোখ তুলে চারিদিক তাকিয়ে হয়তো সেদিন দেখব; নিজেকে বাঁচাবার মতো কোন মানুষই আমার পাশে নেই। জীবনে নেমে আসতে পারে দুঃসহ নিঃসীম আঁধার।

বহরমপুর থেকে প্রকাশিত 'ঝড়' পত্রিকা ৩ ডিসেম্বর '১২ সংখ্যা থেকে গৃহীত

বার্ষিক সূচি : ২০১২

সম্পাদকীয় / ঘটনাপ্রবাহ / পাঠকের কলমে / স্মরণ / পত্রপত্রিকা থেকে / গ্রন্থ সমালোচনা / বিতর্ক

টুইডিলডি আর টুইডিলডাম/সম্পাদকীয়/১/জানু-ফেব্রু
সরকার আছে সরকারেই/৭/ঐ
বিশ্ব-পুঁজিবাদ কি গভীরতর সংকটের মুখোমুখি?/৮/ঐ
কত হাজার মরলে পরে.../ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়/২০/ঐ
নীল কিন্তু যন্ত্রণার-ই রং!/সম্পাদকীয়/১/মার্চ
তসলিমা-র '*নির্বাসন*'-এর নির্বাসন/২/ঐ
প্রাক বাজেট চিত্র : ভারতীয় অর্থনীতি/৩/ঐ
পুঁজিবাদী উন্নয়ন—কল্যাণ সান্যালের চোখে/অঞ্জন চক্রবর্তী/৫/ঐ
নারীদিবস, ফেব্রুয়ারি ১৯১৩/আলেক্সান্দ্রা কলন্তাই/৩৯/ঐ
নন্দীগ্রাম থেকে নোনাডাঙ্গা.../সম্পাদকীয়/১/এপ্রিল
'অদৃশ্য হাত' .../ধারা চট্টোপাধ্যায়/১২/ঐ
উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন.../হিরণ্ময় ধর/১৫/ঐ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ.../সমরেশ মিত্র/১৮/ঐ
আত্মসচেতনতার ভাষা/সন্দীপ মুখোপাধ্যায়/৩৯/ঐ
কলকাতা একদিন.../রন্তিদেব সেনগুপ্ত/৮/ঐ
জ্ঞানীরা যখন থমকে দাঁড়ায়, মূর্খরা দেয় ঝাঁপ!/সম্পাদকীয়/১/মে
নোনাডাঙা/শমীক চক্রবর্তী/২/ঐ
বাথানিটোলার 'বিচার'/ধারা চট্টোপাধ্যায়/৫/ঐ
ভদ্রেশ্বর থানায় ধর্ষণ : এপিডিআর প্রতিবেদন/৬/ঐ
গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে একটি আবেদন/১০/ঐ
শতবর্ষে ডাঃ বিজয় বসু/দীপংকর চক্রবর্তী/৩২/ঐ
ভারত-চীন মৈত্রী : ফিরে দেখা/ডা. বিজয় বসু/৩৪/ঐ
পাঠকের কলমে/৪০/ঐ
চৌত্রিশ বনাম এক/সম্পাদকীয়/১/জুন
বিশেষণে সবিশেষ/শঙ্খ ঘোষ/৩/ঐ
নোনাডাঙ্গায় গুণ্ডামির প্রতিবাদ/৫/ঐ
মনমোহন-আলুওয়ালিয়ারা.../ধারা চট্টোপাধ্যায়/৬/ঐ
কয়লা কেলেঙ্কারি/সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়/৭/ঐ
শহর জুড়ে ত্রিশূল আলো/মালবিকা সাহা/৮/ঐ
সোনু সোরি-কমলেশ কাহিনী/পর্যবেক্ষক/১০/ঐ
সোনি সোরির চিঠি/১১/ঐ
সাম্রাজ্যবাদের কুমীর কান্না.../দীপ্তি চন্দ/১৩/ঐ
কুয়ালালামপুর ট্রাইবুনাল/পরিচয় কানুনগো/১৩/ঐ
অভিষেক-সুরেশ— মৃত্যু না হত্যা/শ্যামল দাস/১৫/ঐ
সীমা আজাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড/১৬/ঐ
সমালোচনামূলক শিক্ষণপদ্ধতির সপক্ষে/১৭/ঐ
উন্নয়ন-এর বিকল্প/রতন খাসনবিশ/৩৬/ঐ
মানবাধিকার একটি বিলুপ্তপ্রায় 'প্রজাতি'/সম্পাদকীয়/১/জুলাই
সিঙ্গুরের ফাঁস/প্রণব দে/২/ঐ
রিও+২০ বসুন্ধরা সম্মেলন/দীপঙ্কর দে/৪/ঐ
সিপিআই(এম)-এর ঝুলি থেকে/প্রবীণ রায়/৭/ঐ
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের.../অশোক মিত্র/১১/ঐ
পুঁজিবাদেরসঙ্কটওমার্কসীয়মূল্যতত্ত্ব/গুরুপ্রসাদকর/অতনুভট্টচার্য/১৩/ঐ
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নেপথ্যে/সম্পাদকীয়/১/আগস্ট
অথ শিলাদিত্য কথা/২/ঐ
আবার মারুতি-মানেসর/গৌতম সেনগুপ্ত/৩/ঐ
চিদাম্বরমের কাহিনী/সমরেশ মিত্র/৫/ঐ
বিজাপুর নরমেধ/শ্যামল দাস/৭/ঐ
দারিদ্র্যে ডুবছে দেশ/সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়/৮/ঐ
ঝাঁসি বাহিনীর লক্ষ্মী/৯/ঐ
ভারতীয় কৃষির চরিত্র ও গ্রামীণ সমাজ/সম্পাদকীয়/৩/সেপ্টে-অক্টো
হায় স্বাধীনতা!/সম্পাদকীয়/৫/সেপ্টে-অক্টো
সংস্কার রাজনীতির আরেক অধ্যায়/সুতনু ভট্টাচার্য/১৩২/ঐ
অথ রিটেল-দৈত্য কাহিনী/প্রণব দে/১৩৫/ঐ
বিদ্যুৎ নীতি প্রসঙ্গে/সঞ্জিত বিশ্বাস/১৩৮/ঐ
নিউক্লিয়ার শক্তি-কেন্দ্র/সৌম্য দত্ত/১৪০/ঐ
ব্রাই বিল ও জিন প্রযুক্তি/শুভ্রকেতন বসু/১৪৪/ঐ
বাথানীটোলার রায়/অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়/১৪৭/ঐ
মুসলমানদের সঠিক দিশা দিতে ব্যর্থ/গিয়াসুদ্দিন/১৫০/ঐ
অনাগত/দীপংকর চক্রবর্তী/১৫২/ঐ
শাসক যখন শাসন করতে জানে না/সম্পাদকীয়/১/নভে
দুই দেশ, দুই নির্বাচন.../দীপ্র চৌধুরী/২/ঐ
ডাক্তারি স্নাতকোত্তরে ভর্তি/শোভন গুহ/৪/ঐ
এরিক হব্‌সবম/সিদ্ধার্থ গুহ রায়/৩২/ঐ
হান সুইন স্মরণে/৩৩/ঐ
কুং চিংলান কোটনিস/মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত/৩৪/ঐ
বিতর্ক: কানোরিয়া/প্রফুল্ল চক্রবর্তী/কুশল দেবনাথ/৩৬/ঐ
পার্লামেন্ট কি সত্যি সত্যিই শুওরের খোঁয়াড়?/সম্পাদকীয়/১/ডিসে
বাল থ্যাকারে/শরদিন্দুশেখর রায়/২/ঐ
আবার দোহা/সমরেশ মিত্র/৪/ঐ
'আধার' প্রকল্প/দীপাঞ্জন সারখেল/৩৭/ঐ

প্রবন্ধ

সিঙ্গুর— ফিরে দেখা/গার্গী সেনগুপ্ত/৯/জানু-ফেব্রু
কানোরিয়া জুট শ্রমিক আন্দোলন/কুশল দেবনাথ/১২/ঐ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন আর মুক্ত মানুষের/জোনাথন টুলি/১৭/ঐ
একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিক.../জন বেলামি ফস্টার ইত্যাদি/২২/ঐ
রাষ্ট্র ও পুঁজি : প্রেক্ষাপট ভারতবর্ষ/রতন খাসনবিশ/৩১/ঐ
আমাদের সঞ্চয় থেকে ওদের পুঁজি/সুতনু ভট্টাচার্য/৩৮/ঐ
'বিশ্বায়ন' সংকটে, এ সংকট বিশ্ব.../ফারুক চৌধুরী/ ৪৩/ঐ
বিশ্বায়নের জলছবি/আশিসকুসুম ঘোষ/৪৬/ঐ

বিশ্বায়ন ও শ্রমিকের অধিকার/নব দত্ত/৪৯/ঐ
বিগত দুই দশকে ভারতীয় মিডিয়ার বিবর্তন/সুচরিতা সেন/৫৪/ঐ
বিশ্বায়ন ও আদিবাসী : লড়াই-এর মূল/শুচিব্রত সেন/৫৯/ঐ
বিশ্বায়ন ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিরা/শ্যামল দাস/৬১/ঐ
ভারতে বিশ্বায়নের দুটি দশক/সমরেশ মিত্র/৬৪/ঐ
গণ-সংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস/খালেদ চৌধুরী/৭৮/ঐ
অগ্নিখেলার সাথী/অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী/৮২/ঐ
প্রসঙ্গ ঃ হেমাঙ্গ বিশ্বাস/দীপংকর চক্রবর্তী/৯১/ঐ
গণনাট্য-আন্দোলনে আমার গান / গণসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত / লোক-সঙ্গীতের দৃষ্টিকোণ/হেমাঙ্গ বিশ্বাস/১০৫/ঐ
সংবাদমাধ্যমের দায়/মালবিকা মিত্র/৭/মার্চ
তপ্ত তাওয়া কিংবা ফুটন্ত.../সন্দীপ/৯/ঐ
বিদ্যাস্থানে ভয়/মালবিকা সাহা/১২/ঐ
পরিবর্তনের পশ্চিমবঙ্গে/গৌতম সেনগুপ্ত/১৭/ঐ
পঃবঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবা/সিদ্ধার্থ গুপ্ত/১৯/ঐ
শতবর্ষে দেবব্রত বিশ্বাস/প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী/২৫/ঐ
প্রসঙ্গ : সুধী প্রধান/দীপংকর চক্রবর্তী/২/ঐ
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র/সুস্মিতা রায়চৌধুরী(মৈত্র)/৩৭/ঐ
'মা-মাটি-মানুষ'-এর গণতন্ত্র/দীপংকর চক্রবর্তী/২/এপ্রিল
নোনাডাঙ্গা.../দীপ্র চৌধুরী/৫/ঐ
মাইনে কেটে কণ্ঠরোধ.../পরিচয় কানুনগো/১০/ঐ
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইতিহাস.../ শুভ্রকেতন বসু/২০/ঐ
'পরিবর্তন'-এর আগে ও পরে/পার্থ সারথি/৩১/ঐ
সিপিআই(এম)-এর মতাদর্শ/প্রবীণ রায়/১৩/মে
আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেবার দায়/নব দত্ত/২৩/ঐ
মমতা সরকারের নয়া জমি আইন/প্রণব দে/২৮/ঐ
কেমন আছে জঙ্গলমহল/বিশ্বজিৎ রায়/১৮/জুন
পরিবর্তনের অন্য স্বর/অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়/২৮/ঐ
জমি অধিগ্রহণ বিল/প্রণব দে/৩১/ঐ
অভিযোগের খেলা/সি পি চন্দ্রশেখর/৩৪/ঐ
এপিডিআর:৪০ বছর:ফিরে দেখা/অমিতদ্যুতি কুমার/৯/জুলাই
শিক্ষার গঙ্গাযাত্রা/শুভাশিস মুখোপাধ্যায়/১৮/ঐ
প্রাথমিক শিক্ষার ইতিবৃত্ত/সুনন্দ সান্যাল/২৪/ঐ
সরকারি স্কুলই একমাত্র বিকল্প/সংগ্রাম মুখার্জী/২৭/ঐ
বেচো না বেচো না/সলিল বিশ্বাস/৩১/ঐ
কেমন আছে জঙ্গলমহল (২)/বিশ্বজিৎ রায়/৩৫/ঐ
জঙ্গলমহলে মাওবাদী রাজনীতি(৩)/বিশ্বজিৎ রায়/১০/আগস্ট
বিশ্বজোড়া স্থবিরতা ও চীন/জন বেলামি ফস্টার/২২/ঐ
প্রসঙ্গ: 'ভারতে মাওবাদী'/হর্ষ ঠাকোর/৩৪/ঐ
ভারতে আধা-সামন্ততন্ত্র/অমিত ভাদুড়ি/১১/সেপ্টে-অক্টো
ভারতের কৃষিতে পুঁজিবাদের ব্যাহত... /উৎসা পট্টনায়ক/১৭/ঐ
এক কৃষকের কথা/বিমান/২৯/ঐ
ভারতীয় কৃষির আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র/গুরুপ্রসাদ কর/৪১/ঐ
ভারতীয় কৃষির চরিত্র/চিত্তরঞ্জন দাশ/৪৯/ঐ

ভারতীয় কৃষির বৈপরীত্যের আকার ও.../কার্তিক পাল/৫৫/ঐ
পশ্চিমবাংলার কৃষি ও কৃষকের বর্তমান.../প্রদীপ সিংহ ঠাকুর/৬৩/ঐ
ভারতে পুঁজিবাদী কৃষির বিকাশ ও.../অভিনব সিংহ/৬৯/ঐ
ভারতীয় সমাজের চরিত্র নির্ধারণ ও.../কে এন রামচন্দ্রন/৭৬/ঐ
বির্তকের প্রত্যাবর্তনে ভারতীয় কৃষিতে ধনতন্ত্র/সুদীপ্ত ভট্টাচার্য/৮১/ঐ
বিশ্বায়িত পুঁজিবাদ ও ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা/সুকান্ত রায়/৮৭/ঐ
ভূমি সংস্কার ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি/রতন খাসনবিশ/৯৮/ঐ
জ্বালানি, জল ও ভাত-রুটির গল্প/দীপঙ্কর দে/৫/নভে
ভারতে আসন্ন দুর্ভিক্ষ/বিনায়ক সেন/১৯/ঐ
অসম: স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন/সঞ্জয় হাজারিকা/২২/ঐ
নিউক্লিয়ার চুল্লি বিরোধী আন্দোলন/সৌম্য দত্ত/২৮/ঐ
ইসরায়েলি আগ্রাসনের নতুন অধ্যায়/দীপ্র চৌধুরী/৬/ডিসে
বর্তমান ইউরোপের চালচিত্র/সুচরিতা সেন/১০/ঐ
সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার/সিদ্ধার্থ গুপ্ত/১৪/ঐ
স্বদেশ, স্বরাজ ও স্বরাজ্য/গর্গ চট্টোপাধ্যায়/১৯/ঐ
আর্থিক অভিজাততন্ত্র ও ভারত সরকার/বার্নি/২৩/ঐ

কবিতা

সুবিমল চক্রবর্তী/অচিন্ত্য সুরাল/সব্যসাচী দেব/বিশ্বজিত সেন/অশোক চট্টোপাধ্যায়/৫-৬/জানু-ফেব্রু
নালিয়াপুল/নির্ভয়/কাস্তেটারে দিও জোরে শান/জালিনাবাগের জালালাবাদের/মাউন্ট ব্যাটেন মঙ্গল কাব্য/ভেদি অনশন মৃত্যু / শঙ্খচিল/আমরা তো ভুলি নাই শহীদ/পূর্বদিক লাল/আরো বসন্ত বহু বসন্ত /আমরা করবো জয় /আজাদী হয়নি আজও তোর/জন হেনরী/হেমাঙ্গ বিশ্বাস/৯৮/ঐ
কবিতা পড়া শুরু করার আগে.../তড়িৎ চৌধুরী/১৪/এপ্রিল
মেঘপরীদের গান/রাজেশ দত্ত/১১/মে
রি-থিংকিং-এ যাঁরা নিবিষ্ট.../বিশ্বজিৎ সেন/১১/ঐ
ঠাঁই/সব্যসাচী গোস্বামী/১২/ঐ
ছড়া/সৃজন সেন প্রভৃতি/১২/ঐ
স্বপ্ন দেখার গল্প/দেবব্রত কর্ম্মকার/৪০/জুন
কবীর সুমনের গান/২/আগস্ট
প্রশ্ন তোলা/সব্যসাচী গোস্বামী/২১/ঐ
শঙ্খ ঘোষ/সব্যসাচী দেব/অশোক চট্টোপাধ্যায়/বিশ্বজিত সেন/সৃজন সেন/বিশ্বনাথ গড়াই/ভিক্টর হারা (অনুবাদ : ভাস্বতী ঘোষ)/অচিন্ত্য সুরাল/বিপুল চক্রবর্তী/৭/সেপ্টে-অক্টো
আমার দিকে তাকাবে না?/নাহিদা/৪০/নভে

গল্প

সায়েব ও লোকটা/অমর মিত্র/১০৭/সেপ্টে-অক্টো
কবিতার ছুটির দিনগুলি/মীনাক্ষি সেন/১১০/ঐ
আপদ বিদায়/দীপঙ্কর দাস/১১৭/ঐ
মানুষ আর কুকুরের গল্প/অভিজিৎ সেনগুপ্ত/১২৩/ঐ
আর্তি/সঞ্জীব আচার্য/১২৮/ঐ

কার্টুন

ঋতুপর্ণ বসু/৬/সেপ্টে-অক্টো